

ছোটদের

ছোটগল্প

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ছোটদের
ছোটগল্প



সে অনেকদিন আগের কথা। রাজাগণ কেবল রাজ্যস্থাপন করিয়া বসিয়াছেন, ঋষি-মুনিগণ তখনও তপস্যা করিতেন বনে জঙ্গলে।

মানুষ তখনও সংখ্যা গুনিতে জানিত না, প্রয়োজনও ছিল কম।

সেই যুগের মানুষ বংশলোচন বাচস্পতি। অরণ্যেই ছিল তাঁহার বাস; কিন্তু তাই বলিয়া যোগ-তপস্যাতেই শুধু যে কাটাইয়াছেন জীবন এমন নয়; বিদ্যার সাধনাই ছিল তাঁহার প্রধান কাজ। সর্বশাস্ত্রে লাভ করিয়াছেন ব্যুৎপত্তি—যাহাকে একেবারে রীতিমত বলে শাস্ত্রে পারংগম।

একাকী বিদ্যাচর্চা করিয়াছেন বংশলোচন, আয়ু এখন হেলিয়াছে পশ্চিমের দিকে। একাকী একদিন বটবৃক্ষতলে বসিয়া ভাবেন তিনি,

ছোটদের ছোটগল্প

শশিভূষণ দাশগুপ্ত

ভারতী লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা-১২

এত বিদ্যা শিখিলাম তাহা যদি আর কাহাকেও না শিখাইলাম তবে ত সবই বৃথা হইল। লোভ যায় কিছু ছাত্র সংগ্রহ করিয়া চতুষ্পাঠী খুলিতে।

কিন্তু ছাত্র ত না হয় কিছু যোগাড় করা গেল, খরচ বহন করিবে কে? ভাবিয়া কিছু দিশা পান না বংশলোচন।

একদিন ঐরূপ চিন্তান্বিত মনে বসিয়া আছেনা বংশলোচন সেই বটবৃক্ষের নীচে। হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, সেই বনপথ দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছেন এক জটাজুটধারী ঋষি। গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে ভস্ম, হাতে কমণ্ডলু। দেখিয়া বংশলোচনের মনে হইল সাক্ষাৎ মহেশ্বর।

ঋষিকে দেখিয়া বংশলোচন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সাষ্টাঙ্গে ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন ঋষির পায়ের কাছে। ঋষি বলেন,—কর কি, ওঠ ওঠ—

কিন্তু পা ছাড়েন না বংশলোচন বাচস্পতি। বলেন,—বাবা আপনি সাক্ষাৎ শিব।

ঋষি বলেন,—তা শিব হই আর যা হই,—চাই কি তোমার?

বংশলোচন পা দুইটা আরও জড়াইয়া ধরিয়া বলেন,—ছলনা ক'র না বাবা এই অধমকে; মনের কথা কি তোমাদের কিছু অজ্ঞাত থাকে? নিজেই বুঝে নাও সব।

ঋষি দেখিলেন, নাছোড়বান্দা বংশলোচন, বলিলেন, আচ্ছা পা ছাড়, বলছি আমি সব কথা।

আশ্বস্ত হইয়া পা ছাড়েন বংশলোচন। ঋষি সেই ধূলামাটির ভিতরেই টান হইয়া বসিলেন আসনে, ধ্যানে জানিয়া লইলেন বংশ-

লোচনের সব মনের বাঞ্ছা। খানিকক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া বলিলেন,—ছাত্র পড়াবার ব্যবস্থা চাই ?

ভক্তিতে কম্পিত হইয়া বংশলোচন বলেন,—সাক্ষাৎ মহাদেব তুমি বাবা, ঠিক ধরেছ।

আবার চোখ বুজিয়া ধ্যানস্থ হন ঋষি। বহুক্ষণ পরে চোখ মেলিয়া বলেন,—এই বন ধ'রে অগ্নিকোণে সোজা চলে যাও। চলতে চলতে



দেখতে পাবে সাতমুখী একটা নদী। তারই বায়ুকোণে দেখতে পাবে একটা রাজবাড়ি। সে বাড়িতে থাকেন রাজা কর্কট সেন। শরণাপন্ন হও গিয়ে তাঁর, পূর্ণ হবে তোমার মনস্কাম।

তারপরে আবার বনের ভিতরে অদৃশ্য হইয়া যান সেই জটাজুটধারী ঋষি। ঋষি যেখানে পাতিয়াছিলেন তাঁহার আসন, সেখানকার খানিকটা ধূলামাটি তুলিয়া বংশলোচন মাখেন তাঁহার সর্বদেহে। তারপর সোজা রওনা হন অগ্নিকোণ ধরিয়া।

সে কি পথ! কোথাও উপলবন্ধুর, কোথাও গভীর অরণ্য, কোথাও নদীনালা। কিন্তু ফেরেন না বংশলোচন বাচস্পতি।

কতদূর আগাইয়া সত্যই দেখিতে পাইলেন একটা সাতমুখী নদী, সাতদিকে চলিয়াছে জলের সাতটা স্রোত। দেখিয়া তাক্ লাগিয়া যায় বংশলোচনের; ভাবেন মনে মনে, কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী, ঋষি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ মহাদেব।

রাজবাড়ি উপস্থিত হইয়া রাজার দর্শন প্রার্থনা করেন বংশলোচন। রাজা আসিলেন, সঙ্গে আসিলেন মন্ত্রী।

রাজা বলেন,—কি প্রার্থনা ব্রাহ্মণ?

বংশলোচন জানায় চতুষ্পাঠীর প্রার্থনা। ছাত্র সে নিজেই যোগাড় করিবে, চাই ধন।

রাজা তাকান মন্ত্রীর দিকে। মন্ত্রী মাথাটাকে ডাইনে হেলান, বামে হেলান, অগ্রে আনেন, পশ্চাতে ফেরান, নিম্নে তাকান, ঊর্ধ্বে তাকান; তারপরে বলিলেন,—মহারাজ, ব্রাহ্মণের ধন গোধন; চতুষ্পাঠী করিতে ব্রাহ্মণকে গোধন দান করুন।

রাজা দান করিলেন দুগ্ধবতী অনেক গাভী। অল্প কয়েকজন ছাত্র সংগ্রহ করেন বংশলোচন। জমিয়া গেল বটবৃক্ষের তলেই বংশলোচন বাচস্পতির চতুষ্পাঠী।

এইরূপ চলে কিছুদিন।

রাজা কর্কট সেন আবার একদিন দেখিলেন—রাজসভার প্রান্তে বসিয়া আছেন বংশলোচন বাচস্পতি। সসম্ভ্রমে ডাকিয়া বলিলেন,—কি ব্রাহ্মণ, আবার কি চাই ?

বংশলোচন বলিলেন,—মহারাজ, গোধন অনেক দিয়াছিলেন, কিন্তু যে ক'টি ছাত্র, শুধু সেই ক'টি গোরুই আছে, বাকি গোরুগুলি যে কি হ'ল কিছুই বোঝা গেল না।

মহারাজ বলিলেন,—কেন ?

বংশলোচন বলেন,—মহারাজ প্রতিদিন ছাত্রেরা গোরু নিয়ে বেরোয় চরাতে। কটা নিয়ে বেরোয়, কটা নিয়ে ঘরে ফেরে, তা ত ঠিক ক'রে বুঝবার কোন উপায় নেই, শুধু গোরুর রং দেখে ঠিক রাখতে হয়। এত গোরুর কি রং ঠিক রাখা যায় মহারাজ ? রোজই তাই কিছু হারিয়ে যায়। হারাতে হারাতে গোহাল যে খালি হয়ে এল,—এতগুলি লোক এখন খাব কি ?

বারংবার মাথা চুলকান মহারাজ, ঘন ঘন তাকান মন্ত্রীর প্রতি —তাইত মন্ত্রী, এখন কি করা যায় ?

মন্ত্রী ভাবিতে সময় লইলেন অনেকদিন, অনেকরাত্রি। শেষটায় আসিয়া বলিলেন, মহারাজ গাভী পিছু একটা করিয়া লোক দিন এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে, গোরু হারাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

সেই ব্যবস্থাই হইল। লোকে ভরিয়া গেল বংশলোচনের চতুষ্পাঠী। গোরু এখন হারায় না বটে ; কিন্তু এত লোককে এই আশ্রমে পুষিয়া রাখে কে ?

ভাবনা চিন্তা আর কিছুতেই ছাড়ে না বংশলোচনকে। কিন্তু

এইভাবেই দিন চলে, চতুষ্পাঠী ভরা কেবল গোরু আর প্রতিটি গোরুর পিছনে একটি করিয়া রক্ষক।

সেদিন বিকেলবেলা নদীর তীরে বসিয়া মহাভারত পড়াইতেছিলেন বংশলোচন তাঁহার ছাত্রগণকে। তালপাতায় লেখা মহাভারত ;— তখন ত সংখ্যা ছিল না, তাই বলিতে হয়, মহাভারতের সেই তাল-পাতার পুঁথিতে পাতা ছিল অসংখ্য ;—মাটি হইতে পুঁথিখানি ছিল দেড় হাত উঁচু।

তন্ময় হইয়া পড়াইতেছে গুরু—তন্ময় হইয়া শুনিতেছে শিষ্যগণ। বনপত্র-মর্মরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া আসিল একটা ঘূর্ণ হাওয়া, মুহূর্তে উড়াইয়া লইয়া গেল মহাভারতের পাতাগুলি ; খেয়ালবশে সেগুলি ছড়াইয়া দিল এখানে সেখানে—কোথায়—কতদূরে !

কপালে আঘাত করিয়া হায় হায় করিয়া উঠিলেন বংশলোচন। ছোটো—সকলে ছোটো, সংগ্রহ কর সবগুলি পাতা—একটাও যেন না হারায়।

সংগৃহীত হইল অনেক পাতা ; কিন্তু তাহাই সব কিনা কি করিয়া বোঝা যায়? তা ছাড়া কোন্ পাতার পর কোন্ পাতাটা বসিবে তাহাই বা স্থির করিবার উপায় কি ?

বিষণ্ণ মনে বসিয়া বসিয়া অনেক ভাবেন বংশলোচন,—এখন উপায় কি ?

উপায় আর কিছুই আসে না মাথায়। তখন অনন্যোপায় হইয়া তিনিও আসনে বসিলেন. ধ্যানে স্মরণ করিতে লাগিলেন সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর।

সর্বজ্ঞ এই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী—আবার আসিয়া দেখা দিলেন বংশলোচনের সম্মুখে,—কি হে কি চাই ?

চোখের জলে সন্ন্যাসীর পা ভিজাইয়া বংশলোচন বলেন,—কি হবে প্রভু আমার মহাভারতের ?

প্রভু বলিলেন,—এক কাজ কর, একখানি একখানি করিয়া পাতা প'ড়ে যাও,—যে পাতাখানি যে পাতার সঙ্গে মেলে, তাকে সেইভাবে মিলিয়ে নাও, তবেই দেখবে আবার গোটা মহাভারত পেয়ে যাবে।

অগত্যা সেই চেষ্টাই করেন বংশলোচন। কিন্তু কাটিয়া যায় অনেক বৎসর। কয়েকটি মাত্র ছাত্র লইয়া এতবড় বই তিনি কিছুতেই মিলাইয়া উঠিতে পারেন না।

হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে তাঁহার মন। একদিন বিমর্ষমুখে আবার গিয়া উপস্থিত হন রাজবাড়ি।

ব্রাহ্মণের সব কথা শোনেন রাজা। তাইত, কি বিপদ ! কি হইবে উপায়। পরামর্শের জন্য ঘন ঘন মন্ত্রীর দিকে তাকান রাজা।

মুখ গম্ভীর করিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া অনেকক্ষণ ভাবেন মন্ত্রী, তারপরে বলেন রাজাকে,—মহারাজ, এক কাজ করতে হবে। ব্রাহ্মণের মহাভারতে যতগুলি পাতা আছে, রাজদুর্গ হ'তে ততগুলো সৈন্য পাঠান। তারা প্রত্যেকে একটা ক'রে পাতা ধ'রে থাকবে। ব্রাহ্মণ তখন যে-পাতার পরে যে-পাতা, তা প'ড়ে লোকগুলোকে আগে সাজিয়ে নেবে, তারপরে তাদের হাত থেকে সব পাতাগুলি জড় ক'রে নিলেই আবার গোটা বই পাওয়া যাবে।

মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন,—তা বটে, কিন্তু বড় ব্যয়-বাহুল্য।

—কিন্তু মহারাজ উপায় কি?

—তাইত।

অতএব সেই ব্যবস্থাই হইল। দুর্গ হইতে কুচ্‌কাওয়াজ করিয়া সারি সারি সৈন্য চলিল ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে। বন-বাদাড় সব তছ্‌নছ্‌ হইয়া গেল, এখানে সেখানে পড়িতে লাগিল সৈন্যদের তাঁবু, রাজ্যের মানুষ ত তাজ্জব বনিয়া গেল। মহাভারতের পাতা গুছাইতে দুর্গের সৈন্য সবই চলিয়া গেল বংশলোচনের চতুষ্পাঠীতে?

খবরটা কেমন করিয়া পৌঁছিল প্রতিবেশী রাজা মর্কট সেনের কানে। তিনি দেখিলেন, এই ত সুবর্ণ সুযোগ। বহুবার পরাজিত এবং অপমানিত হইয়াছেন তিনি কর্কট সেনের কাছে; কিন্তু এখন ত রাজধানীতে সৈন্য নাই মোটেই, সুতরাং এখনই কর্কট সেনের রাজধানী আক্রমণ করিয়া সকল পরাজয় এবং অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যাক্।

একদিন সকালবেলা। কর্কট সেন বসিয়া আছেন রাজসভায়। সহসা হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিল দূত। বলিল, মহারাজ সর্বনাশ। রাজধানী আক্রমণ করেছে মর্কট সেন।

রাজা বলেন,—কেন, আমার সৈন্য-সামন্ত?

দূত বলে,—তারা সবাই চলে গেছে মহাভারতের পুঁথি ঠিক করতে ব্রাহ্মণের চতুষ্পাঠীতে।

—তবে উপায়?

মন্ত্রী বলেন,—মহারাজ, শীঘ্র লোক পাঠান চতুষ্পাঠীতে, ফিরে আসুক সব সৈন্য, কাজ নেই এখন মহাভারতে।

রাজার আদেশে ছুটিয়া আসিল সব সৈন্য। ভয়ে আবার পলাইয়া যায় মর্কট সেন।

কিছুদিন যায়। ব্রাহ্মণ আবার আসিয়া বসিয়া থাকে রাজসভায় বিষণ্নমুখে,—মহারাজ, শাস্ত্রপাঠ বন্ধ, এখন উপায় ?

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মন্ত্রী এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বলিলেন,—মহাভারতের পাতাগুলি পরস্পর সাজাইয়া প্রত্যেক পাতার কোণায় একটা পারস্পর্যের চিহ্ন দিয়া রাখা হউক, তবে আর কোন গোলমাল হইবার সম্ভাবনা নাই।

চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া আসিয়া আবার তাহাই করিতে থাকেন বংশলোচন।

কিন্তু পাতার যে আর শেষ নাই, কত চিহ্ন দিবেন বংশলোচন ! নূতন চিহ্ন ত আর মাথায় জোগায় না !

ফিরিয়া আসেন বংশলোচন রাজসভায়, বলেন,—মহারাজ, নোতুন চিহ্ন ত আর জোগায় না মাথায় !

শুনিয়া মহারাজ বলেন,—তাইত !

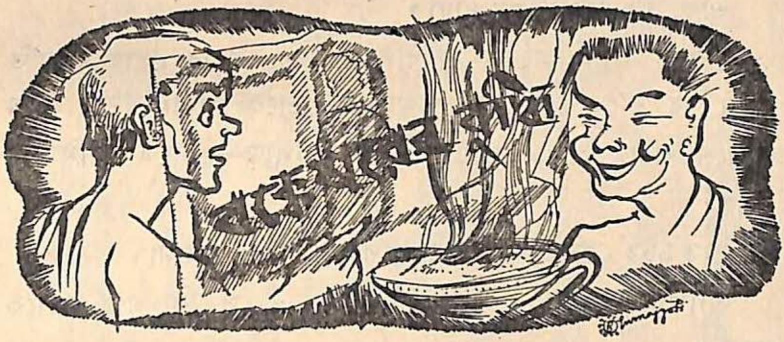
মন্ত্রীও বলেন,—তাইত !

আবার ভাবিতে বসেন মন্ত্রী ; উর্বর মস্তিষ্ক তাঁহার। হুঁ, এইবারে ঠিক হইয়াছে। মন্ত্রী বলিলেন,—ব্রাহ্মণ, এক কাজ করুন। প্রথমে গোটা কয়েক চিহ্ন ঠিক ক'রে নিন, তার পরে সেই গুলোকেই একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে নোতুন নোতুন চিহ্ন তৈরী ক'রে ফেলুন।

বংশলোচন চতুষ্পাঠীতে ফিরিয়া এইবারে দেখিলেন, কাজটা ত অতিশয় সোজা !

তিনি প্রথম যে চিহ্ন কয়েকটা আবিষ্কার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাই—এক হইতে নয় এবং শূন্য। এই করিয়াই সংখ্যা গণনার আবিষ্কার হইয়া গেল।

বংশলোচন বাচস্পতির চতুষ্পাঠী দিন দিন সমৃদ্ধতর হইয়া উঠিতে লাগিল, মহারাজ কর্কট সেনও সুখে সোয়াস্তিতে দিন যাপন করিতে লাগিলেন।



কেরে যাচ্ছিস, বক্কেশ্বর নাকিরে ?

আজ্ঞে দাদা ঠাকুর, হ্যাঁ—আমি—।

বড় পালিয়ে পালিয়ে চলছিস্ যে আগে আগে ?

পালিয়ে যাব কেন দাদা, এই হাটে একটু কাজ ছিল—বলিয়াই বক্কেশ্বর সব ক'টি দাঁত বাহির করিয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল।

হাটের পথে চলিয়াছিল গঙ্গারাম ঠাকুর। হাটে তেমন কোন কাজ ছিল না, আসিয়াছে এই বক্কেশ্বরেরই খোঁজে। বক্কেশ্বরের হাসির বহর দেখিয়া গঙ্গারামের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। ভ্রু কুঁচাইয়া বলিল,—বলি গাঁয়ে কি বাস করতে চাস, না জেলের ভাত খেতে চাস ?

জেলের ভাত খাব কেন দাদা,—বলিয়া আগাইয়া আসিয়া বক্কেশ্বর রাস্তার মাঝখানেই সাষ্টাঙ্গে শুইয়া পড়িয়া গঙ্গারামের পায়ের ধূলা লইল।

ঢের হয়েছে—ঢের হয়েছে—বলিয়া গঙ্গারাম পিছাইয়া গেল।

ওকি, এত চটলে কেন দাদা ?

তোকে আমি অনেক দেখেছি বক্কেশ্বর, এবার তোর বজ্জাতি আমি বের ক'রে দেব, আমি আজিই তোকে থানায় নিয়ে গিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেব,—ব্যাটা চোর—বাটপাড়—তোকে আমি খুন করব।

অত চটছ কেন দাদা, আগে ব্যাপারটা খুলেই বল না।

ব্যাপারটা খুলে বলব থানায় গিয়ে ; সে কি আর তোকে বলব ?

হাটবার, ইতিমধ্যেই রাস্তায় গাঁয়ের অন্য দু'পাঁচজন লোক জড় হইয়াছে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া গঙ্গারাম বলিল,—দেখ হারামজাদার বজ্জাতি—গেল হাটে তিন হাঁড়ি গুড় দিয়েছে আমাকে, আমি নিতে চাই নি, জোর ক'রে গছিয়ে দিয়েছে—বললে, বড় ভাল গুড় দাদাঠাকুর—দামেও তোমাকে সস্তায় দেব, ঘরে নিয়ে রাখি ক'রে খাও। আমি সরল বিশ্বাসে নগদ ন'সিকের পয়সা দিয়ে নিয়ে গেলুম ; বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মাচায় তুলে রেখে দিলুম, ঘরে বলে দিলুম, সাবধান এগুড়ে এখন কেউ হাত দিও না, ফাল্গুন চোত মাসে চিঁড়ে দিয়ে খাব। তারপরে কাল নাতনীটা মাচায় উঠে লাগাল তার দৌরাত্ম্যি—একখানা গুড় গড়িয়ে গেল নীচে পড়ে, একেবারে ভেঙে চুরমার ; দৌড়ে এসে দেখি ভাই—কি বলব তোমাদের—

হাঁড়ির মুখে এই সেরখানেক গুড়, তারপর খড়বিচালি আর কাদামাটি! ব্যাটা আবার রাস্তার মাঝে সাষ্টাঙ্গে পেন্নাম আরম্ভ ক'রে দিয়েছে—



তোকে আজ আমি খুনই করব—বলিয়া গঙ্গারাম একটা লাফ দিয়া আগাইয়া গিয়া বক্কেশ্বরের গলাটা চাপিয়া ধরিল।

গলাটা ছাড়াইয়া লইয়া বক্কেশ্বর বলিল,—কি ক'রে জানব বলত দাদাঠাকুর,—আমিত আর হাঁড়িতে গুড় ভরি নি,—আমার ত কেনা মাল।

কথাটা বক্কেশ্বর এমন সরলভাবে বলিল যে উপস্থিত লোকজনও কথাটা অস্বীকার করিতে পারিল না। বক্কেশ্বরের প্রতিবেশী সায় দিয়া বলিল, তাইত, কি ক'রে বুঝতে পারবে ও?

গঙ্গারাম মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল,—কি ক'রে বুঝতে পারবে—চোরের সাক্ষী যত বাটপাড়! ও নাকি না জেনে করেছে? আমি বলছি, সব জেনে শুনেই আমাকে ঠকাবার মতলবে ও এই সব করেছে।

বক্কেশ্বর বিনীত সুরে বলল—এ তোমার গায়ের জোরের কথা দাদা।

—দেখ, বক্কেশ্বর, আর চটাস নি বলছি।

—আমি না হয় তোমার দাম ফেরৎ দিয়ে সব গুড় ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

—তাই করিস যদি জেলের ঘানি টানতে না চাস, নইলে কপালে তোর দুঃখ আছে জানিস।—বলিয়া গঙ্গারাম হাটের পথ হইতে ফিরিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ি চলিয়া গেল।

লোকজন সরিয়া গেলে বক্কেশ্বর হাসিতে হাসিতে একেবারে প্রতিবেশীর গায়ে ঢলিয়া পড়িল, বলিল আচ্ছা জব্দ করেছি ঠাকুরকে—হিঃ হিঃ হিঃ।

গঙ্গারাম ভাবিয়াছিল, বক্কেশ্বর সত্যই আসিয়া গুড় ফিরাইয়া লইবে। পাঁচ সাত দিনের ভেতরে আর বক্কেশ্বরের পাত্তা নাই। ছেলে পাঠাইয়া সংবাদ লইয়া জানিল, বক্কেশ্বর বাড়িতে নাই, বোনের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছে।

গঙ্গারাম দেখিল, বক্কেশ্বরের দিন দিনই বাড় বাড়িয়া যাইতেছে, একবার একটু শিক্ষা না দিলে আর চলে না। এই এক জীবনে সে যে কতবার ঠকিয়াছে এই বক্কেশ্বরের কাছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অল্প কয়েকমাস পূর্বে বক্কেশ্বরের বুদ্ধি ও উৎসাহেই সে একবার চাউলের কারবার আরম্ভ করিল। দু'একমাস বেশ লাভও হইল। তারপরে বক্কেশ্বর আবার চাউল আনিতে বড় নৌকাটা লইয়া গেল মিরপুরের হাটে। ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, নৌকা হাটের ভিতর হইতে চুরি হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে আর যে দু'জন মাঝি-মাল্লা ছিল তাহাদের নিকটে বহুদিন পরে জানিতে পারিল, নৌকাখানা পথে বিক্রী করিয়া দিয়াছে বক্কেশ্বর এক শ' টাকায়—দশ টাকা ভাগ দিয়াছিল মাঝি দু'জনকেও। কিন্তু তখন আর কিছু করিবার উপায় ছিল না।

কিন্তু এ-রকম ত আর চলিতে দেওয়া যায় না। সন্ধ্যার পরে বুদ্ধি লইতে যায় গঙ্গারাম পাড়ার ঘোষাল মশায়ের কাছে,—পাকা বিষয়ী লোক এই ঘোষাল ম'শাই।

গঙ্গারাম বুদ্ধি একটা ঠিক করিয়াছে,—এখন বাগে আনিতে পারিলে হয় বক্কেশ্বরকে—যে সেয়ানার সেয়ানা।

পনেরো বিশ দিন পরে গঙ্গারাম নিজেই একদিন গেল বক্কেশ্বরের বাড়ি, আর বাড়ির উঠানেই একেবারে চারি চোখে দেখা, সুতরাং বক্কেশ্বর আর বাড়িতে না থাকার দোহাই দিতে পারিল না। গঙ্গারামই

বলিল,—হ্যাঁরে বক্কেশ্বর, কথাটা আমিও এতদিনে বুঝতে পেরেছি ; মিছে মিছি সেদিন রাস্তার ওপরে অতগুলো লোকজনের সামনে তোকে গালমন্দ করলুম। সত্যিই ত হাঁড়ির ভেতরের খবর তুই-ই বা জানবি কি ক'রে ? আর এখন ওগুলো ফিরিয়ে নিলে ত তোরই লোকসান যাবে।

ঘাড় নাড়িয়া বক্কেশ্বর বলিল,—আজ্ঞে দাদা হ্যাঁ, বড় গরীব।

—তাত বটেই, তাত বটেই। আমি সেইজন্যে নিজেই চলে এলুম। ভাবলুম তুই লজ্জায় আমাকে মুখ দেখাস্ না—কথাটা তোর সঙ্গে খোলসা ক'রে নিলেই সব গোল চুকে যায়।

গদগদ হইয়া হিঃ হিঃ করিয়া হাসিয়া পড়ে বক্কেশ্বর।

তারপরে অনেকক্ষণ চলে এ-কথা সে-কথা। কথায় কথায় গঙ্গারাম বলে, -বক্কেশ্বর, সব গাঁয়েই ডাকঘর আছে, আর ডাকঘর নেই একটা আমাদের গাঁয়ে, সেই চারদণ্ডের পথ হেঁটে গিয়ে চিঠি ডাকে দিতে হয় ভজার গাঁয়ে। কেনরে, আমরা তা করতে যাব কেন ?

—তাই ত দাদাঠাকুর, আমরাই বা ছোট কিসে ? যা হয় একটা বিহিত কর।

তাই করতেই ত বেরিয়েছি, বলিয়া গঙ্গারাম মস্ত বড় একখানা কাগজ ধরিল বক্কেশ্বরের সামনে।

—এ আবার কি দাদা ?

—এইটেই ত হ'ল বিহিত। এই দরখাস্ত দেখতে পাচ্ছিস্, দেখছিস্ এই অন্য সবাই সই দিয়েছে—নে, খানিকটা ফাঁক রেখে নিচের দিকে সই ক'রে দে।

বক্কেশ্বর লেখাপড়া তেমন না জানিলেও মোটের উপরে বাঙলা

কোনরূপে পড়িতে পারে, সইও একটা কোনও রকমে করিতে পারে। অনেকক্ষণ কাগজটা নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল সত্যই ডাকঘরের জন্য দরখাস্ত—গ্রামবাসী অনেকেই সই দিয়াছে। বিনীতভাবে বলিল,—কোথায় দেব সই দাদা ?

গঙ্গারাম বলিল,—নে মাঝখানে একটু ফাঁকা রাখ, গাঁয়ের বর্ধিষ্ণু আরও ত অনেকে দেবে, এই নীচের দিকে একটা সই দে।

বক্কেশ্বর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাগজখানির একেবারে শেষের দিকে বাঁকা অক্ষরে নাম সই করিয়া দিল।

তিন চার মাস কাটিয়া যায়।

পৌষ মাসের দিন। রৌদ্রে পিঠ দিয়া, উঠানে বসিয়া বক্কেশ্বর পিঠে খাইতেছে। এমন সময় সহসা দেখা গেল আদালতের পিয়ন, নালিশ হইয়াছে আদালতে দু'শ টাকা দেনার দায়ে।

ছেঁড়া জামাটা কাঁধে ফেলিয়া সহরে চলিল বক্কেশ্বর। আদলতে উপস্থিত হইয়া দেখে সেই ডাকঘরের দরখাস্তের কাগজখানি উপরে দরখাস্তের অংশটা ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে—উপরের সইগুলির অংশটাও ছিঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে। বক্কেশ্বরের সইটির পাশে একখানি স্ট্যাম্প্ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উপরে দু'শত টাকার হ্যাণ্ডনোট—লেখা, বক্কেশ্বরের বাড়ির সংলগ্ন ধানজমিটি বন্ধক রাখিয়া টাকা লওয়া হইয়াছে, সাক্ষী ঘোষাল মহাশয়, দীনু খুড়ো—আরও অনেকে। দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে, সুদে আসলে চার শ' টাকা হইয়াছে। উকিল মোক্তারের সহিত পরামর্শ করিয়া বক্কেশ্বর দেখিল, এ দেনা এড়াইবার উপায় নাই। সে দেনা স্বীকার করিয়া গঙ্গারামের

সহিত টাকা পরিশোধের একটা কিস্তিবন্দী করিয়া লইল। আদালত হইতে বাহির হইয়া গঙ্গারাম হাসিয়া বলিল,—বক্কেশ্বর, এইবারে তোকে হাতে পেয়েছি—নে, এইবার নাকে খত দে,—বলিয়াই গঙ্গারাম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বক্কেশ্বর কিছু না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

পাটের বাজার এবার খুব চড়া, আর গঙ্গারামের একখানা জমিতেই এবার পাট হইয়াছে সাত মণ, তাহা লইয়াই এই কয়দিন ধরিয়া গঙ্গারাম নিকটবর্তী বন্দরে যাওয়া আসা করিতেছে, ফিরিতে রাত হয় অনেক।

সেদিন রাত প্রায় দেড় প্রহরের সময়ে একা একা অন্ধকারে গঙ্গারাম যখন দীঘির পাড় দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল তখন বাঁশবনের ভিতরে সহসা কি যেন খস্‌খস্ করিয়া উঠিল। গঙ্গারাম থমকিয়া দাঁড়াইল।

গ্রামের ভিতরে এই জায়গাটাই সবচেয়ে ভয়ের। এই দীঘির পাড়ের বাঁশবনে নিশাঠাকুরের বাস। এই নিশাঠাকুর রোজ রাত এক প্রহরের সময়ে একবার বাহির হন, খড়ম পায়ে দিয়া চটাং চটাং করিয়া শূন্যের উপর দিয়াই হাঁটিয়া বেড়াইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন; গলায় তাঁহার রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ধূনুচি, মাথায় খাড়া খাড়া চুলগুলির ভিতর দিয়া হঠাৎ দপ্‌ দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে আগুন। এই মূর্তি চলিতে ফিরিতে চোখে পড়িয়া গিয়াছে কত দিন কত গ্রামবাসীর। অনেকেই নাকি দেখিয়াছে ঘনবর্ষার টিপ টিপানি রাতে দীঘির পাড়ের দুই তালগাছের মাথায় দুই পা রাখিয়া ছাতা মাথায় দাঁড়াইয়া থাকেন নিশাঠাকুর; সে ছাতাও কি এইটুকু ছাতা—যেন আকাশ ছোঁয়!

বাঁশবনের খস্‌মস্‌ শব্দ শুনিয়া গঙ্গারাম সাহস করিয়া দাঁড়াইল। সহসা বাঁশবনের শুকনো পাতাগুলি দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে কোন লোকজন নাই। গঙ্গারামের গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল—পৈতাটা হাতে জড়াইয়া গঙ্গারাম রামনাম জপ করিতে আরম্ভ করিল। আগুনটা আবার নিভিয়া গিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। অতিবিকৃত কণ্ঠের একটা সুর শোনা গেল,—গঙ্গারাম—

কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গারাম জবাব দিল,—এঁজ্ঞে।

আমি নিশাঠাকুর, ভয় পাস্‌ নি, করব না কিছু। কিন্তু তুই যে চারিদিক থেকে কেবল টাকা পাচ্ছিস্‌ আমার পূজো দেবার কোন নামও কচ্ছিস্‌ নে তো!

কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গারাম বলিল,—এঁজ্ঞে দেব!

— কবে দিবি?

—আসছে শনিবার।

— শোন্‌ তবে। আর কাউকে কিছু বালস নি, কোন জাঁকজমক হৈ চৈও করিস্‌ নি,—চুপিচাপি রাত এক প্রহরের পরে এসে পূজো দিয়ে যাবি, বুঝলি?

—এঁজ্ঞে।

—আর শোন, ঐ যে বক্কেশ্বরের নামে মামলা করেছিস ও মামলাটা মিথ্যে নয়। যে জমিটা তোর কাছে বাঁধা আছে বলেছিস, ওটা সত্যি তোর, আমার সেবার জন্য ব্রহ্মোত্তর ছিল। ওরা ওটা ঠকিয়ে নিয়েছে, তুই ছাড়িস নি যেন।

গঙ্গারাম ভক্তিতে গদগদ; সব কথাই তবে জানিতে পান নিশাঠাকুর! পথের উপরেই শুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল গঙ্গারাম।

বাঁশবন হইতে আদেশ আসিল,—এখন বাড়ি যা, শনিবারে আসিস।

বাড়িতে আসিয়া গঙ্গারাম কাহাকেও কিছু বলিল না। গঙ্গারামেরা পুরুষানুক্রমে নিশাঠাকুরের পূজারী। এই পরিবারের উপরে নিশাঠাকুরের কেমন একটা অনুগ্রহ আছে, তাই ইহাদের হাতের পূজা ছাড়া আর কাহারও পূজায় তাঁহার মন উঠে না। শোনা যায়, অন্য পুরুত ঠাকুর দু'একবার গিয়াছিল পুজা দিতে, মুখে রক্ত উঠিয়া মরিয়া গিয়াছে।

গঙ্গারামের নিশাঠাকুরের উপর ভক্তি কালরাত্রে হাজারগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা হইলে বঙ্কেশ্বরের ঐ জমিখানি ত আর ছাড়িয়া দিলে চলে না, যেমন করিয়া হোক্ জমিখানি হাত করিতে হইবে।

শনিবার গঙ্গারাম নিজে হাটে গিয়া নিশাঠাকুরের পূজার জিনিস-পত্র কিনিয়া লইয়া আসিয়াছে। বাড়িতে এক গঙ্গারামের স্ত্রী ছাড়া আর কেহই কিছু জানিতে পারিল না।

রাত এক প্রহরের পর চুপিচুপি গঙ্গারাম চলিল নিশাঠাকুরের পুজা করিতে। বাঁশবনের ভিতরে নিশাঠাকুরের পুরানো ঘট পাতা রহিয়াছে। পাশেই একটা অনেককালের গাব গাছ। তাহারই কাছে ধূপদীপ জ্বালিয়া পুজায় বসিল গঙ্গারাম।

পূজায় বসিবার খানিকক্ষণ পরে আবার শোনা গেল নিশাঠাকুরের সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর,—গঙ্গারাম!

আবার কাঁটা দিয়া ওঠে ভয়ে গঙ্গারামের সমস্ত গা, কাঁপিতে কাঁপিতে বলে,—এঁজ্ঞে—

নিশাঠাকুর বলেন,—আমাকে দিতে কি এনেছিস্ গঙ্গারাম—চাল-কলার নৈবিদ্যি ! —ওতে হবে না।

—তবে ?

আমার টাকা চাই, অনেক টাকা।

—অনেক টাকা কোথায় পাব ঠাকুর ?—আরও ভয়ে কাঁপিতে থাকে গঙ্গারাম।

—সেদিন যে সাত মণ পাট বিক্রী ক'রে পেয়েছিস্ সত্তর টাকা,—সে টাকা কোথায় ?

গঙ্গারাম দেখিল, নিশাঠাকুর একেবারে অন্তর্যামী,—বলিল,—

—আছে আছে, সে টাকা আছে।

—তবে নিয়ে আয় সেই টাকা।

দ্বিরুক্তি না করিয়া টাকা আনিতে চলিল গঙ্গারাম।

নিশাঠাকুর গাব গাছ হইতে আবার ডাকিয়া বলিলেন,– গঙ্গারাম, নগদ টাকা যদি আর নাই থাকে তবে এক কাজ কর, সেই বক্কেশ্বরের টাকার খতখানা নিয়ে আয়, অগত্যাপক্ষে ওতেও চলবে।

গঙ্গারাম কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়িতে গিয়া হাত বাক্স খুলিয়া টাকা নগদ সত্তরটি এবং বক্কেশ্বরের হ্যাণ্ডনোটখানি লইয়া আসিল। ভাল করিয়া আবার ধূপদীপ জ্বালিয়া গাঙ্গরাম টাকা সত্তরটি এবং হ্যাণ্ড-নোটখানি নিশাঠাকুরের ঘটের উপরে রাখিয়া দিল।

গাবগাছের উপর হইতে নিশাঠাকুর বলিলেন,—গঙ্গারাম, ও ভাবে ত আমি ও-সব নিতে পারব না।

—তবে উপায় ?

—শোন, ধুনুচিতে অনেক ক'রে ধূপ দিয়ে প্রথমে দুই হাত উর্ধ্বদিকে তুলে একশ'বার পাক খেতে থাক।

গঙ্গারাম আর কথাটি না বলিয়া ধুনুচিতে অনেক ধূপ দিয়া ধুনুচির চারিদিকে একশ'বার পাক খাইল। তারপরে বলিল,—ঠাকুর এখন কি করব ?

এখন একপা উপরে তুলে আর একপায়ের উপরে একদণ্ড দাঁড়িয়ে থাক।

গঙ্গারাম নিরুপায়,—নিশাঠাকুরের বচন অগ্রাহ্য করিবার সাহস নাই, একপায়ে ঠায় তেমনি একদণ্ড দাঁড়াইয়া রহিল। গাব গাছ হইতে নিশাঠাকুর বলিলেন,—এইবার সব টাকা আর কাগজপত্র ধুনুচির আগুনের ভেতরে দে।

গঙ্গারাম মন্ত্রচালিতের মতন তাহাই করিল। দেখিতে দেখিতে কাগজের নোটগুলি এবং হ্যাণ্ডনোটখানি ধুনুচির আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল।

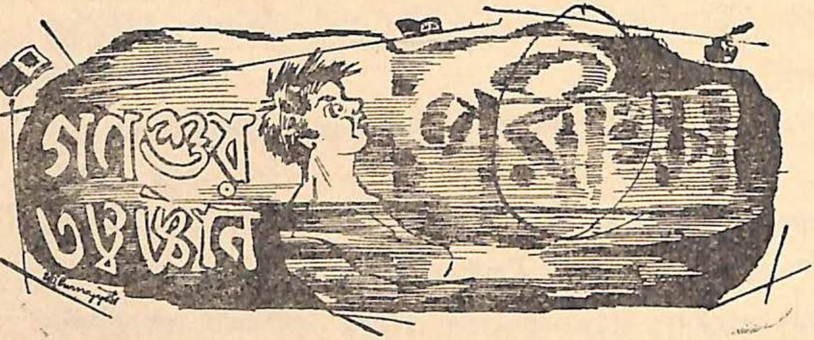
গাব গাছ হইতে নিশাঠাকুর বলিলেন, এবারে পেন্নাম ক'রে বাড়ি যা।

গঙ্গারাম নিশাঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বাড়ির মুখে চলিল। বাঁশবন হইতে বাহির হইতেই হঠাৎ বক্কেশ্বরের সহিত দেখা। জিজ্ঞাসা করিল,—কিরে বক্কেশ্বর, এত রাতে তুই কোথেকে ?

বক্কেশ্বর সব কটি দাঁত বাহির করিয়া বলিল,—ঐ গাব গাছ থেকে দাদাঠাকুর।

আঁতকাইয়া উঠিয়া গঙ্গারাম বলিল,—এ্যাঁ—তবে সবই তোর কাজ বক্কেশ্বর ? তুই আমার সর্বনাশ করলি ?

বক্কেশ্বর হাসিয়া বলিল—আজ গিয়ে ঘুমোও দাদা—কাল সকালে কথা হবে।—বলিয়াই হাসিতে হাসিতে বক্কেশ্বর অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল।



খেলাটা আজ যা জমিয়াছিল, সে একেবারে ভীষণ! দুইদিন ধরিয়া প্রায় অঝোরে বৃষ্টি পড়িয়াছে, এই আজ বিকালেই জলটা ধরিয়াছে। গুপীদের বাড়ির আমবাগানের ঠিক পিছনের চাতালে জল দাঁড়াইয়া গেছে প্রায় এক হাঁটু! সেইখানেই আজ ছিল ম্যাচ খেলা—ঘোষ-পাড়ার আজাদ হিন্দ্‌-দল আর বোস-পাড়ার ডরি-না-কাকেও ক্লাবের এই শেষোক্ত ক্লাবের নেতা আমাদের গণ্‌শু। ফুটবলের তাহাদের অপ্রাচুর্য নাই কিছুই। বর্ষার শেষে প্রতি বছর গাঙ্গুলী-ভিটার বাতাবি গাছগুলিতে প্রচুর বাতাবি ধরিয়া থাকে; সেই কাঁচা বাতাবি ছিঁড়িয়া আনিয়া খানিকটা গরমজলে সিদ্ধ করিয়া লইলেই সেগুলি চমৎকার নরম হয়, ফাটিয়া যায়ও দেরীতে; ইহার দুইটি হইলেই প্রায় দিনের খেলা চলিয়া যাইত। আজ অবশ্য

ম্যাচ খেলা বলিয়া চারিটা বাতাবিই তাহারা সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। ইহা লইকা গাঙ্গুলীদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়াই ছিল; কিন্তু পাড়ার সব ছেলে একজোট বলিয়া ব্যাপারটা গাঙ্গুলীদের যতই ক্ষতিকর এবং অপ্রীতিকর হোক না কেন, বৃহত্তর ক্ষতি এবং অপ্রীতি এড়াইবার জন্য তাহারা ইহা লইয়া এখন আর বেশি ঘাঁটায় না।

একহাঁটু জলের মধ্যে আজ যে খেলাটা জমিয়াছিল, তাহাকে ঠিক খেলা না বলিয়া পুরাণোক্ত সমুদ্রমন্থনেরই পুনরভিনয় বলা যাইতে পারে। জয় শেষ পর্যন্ত ডরি-না-কাকেও-ক্লাবের সেটা প্রায় পূর্বেই জানা ছিল। খেলা এবং তৎপরবর্তী বিজয়োল্লাসের জটলা সারিয়া বাড়ি ফিরিতে গণ্শুর আজ সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। জলে-কাদায় ভূষণ্ডিত সাজিয়া বাড়ি ফিরিতেই গণ্শু দেখিল, ঠাকুমা বাইর-বাড়ির ঠাকুরঘরের বারান্দায় জবুথবু বসিয়ামালা জপ করিতেছেন। গণ্শুকে দেখিতে পাইয়া ঠাকুমা চাপাকণ্ঠে তর্জনের সুরে ডাকিলেন—'এদিকে আয় পোড়ারমুখো!'

এসব সম্বোধনে গণ্শু এখন নিত্য-অভ্যস্ত। গণ্শু ঠাকুমার কাছে আগাইতেই ঠাকুমা বিড়-বিড় করিয়া বলিলেন,—'অপহতা দস্যি দানো কোথাকার!—আমার হাড়-মাস জ্বালাতে জন্মেছে এই ছেলে। বলি তোর আক্কেল কি গা? এই পড়া পড়া ক'রে মা বাপের বকুনিতে বকুনিতে, মারধরের চোটে আমি ত একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম,—, তোর কি তাতে কিছুই ভোগায় না'—কোন গেরাহ্যিই নেই?'

বিরক্তি ভরে গণ্শু বলিল—'আঃ, রোজ সেই এক কথা'—বলিয়াই সে একেবারে মোড় ফিরিয়া ঘরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

দাঁতে দাঁতে খিঁচিয়া ঠাকুমা বলিলেন,—'যাস্‌নে বলছি গোঁয়ার-গোবিন্দ—ঐ বেশে আজ ঘরে ঢুকলে আর রক্ষে থাকবে না বলে দিচ্ছি—হাড়-মাস পৃথক্ হয়ে যাবে।'

কিন্তু গণ্‌শু কোনও কথা গ্রাহ্য না করিয়া প্রায় সোজা ঘরের দিকে চলিল।

'দেখো ছেলের কাণ্ড!—ছেলে নয় ত শুয়োর—বাদাবনের বুনো শুয়োর—যে দিকে গোঁ ধরবে—ঠিক সেই দিকেই'—বলিতে বলিতে ঠাকুমা প্রায় ঠাকুরঘরের বারান্দা হইতে লাকাইয়া নীচে পড়িলেন এবং কাদার মধ্যেই আগাইয়া গিয়া গণ্‌শুর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিতে লাগিলেন। অন্ধকারে জলে-কাদায় টানা হেঁচড়ায় পচ্ করিয়া খানিকটা কাদা আসিয়া ঠাকুমার গায়ে নাকে মুখে লাগিতেই ঠাকুমা আবার খেই-খেই করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—'মলুম, মলুম,—এই অপহতা নচ্ছারটাই আমার কাল ছিল!' বলিতে বলিতে ঠাকুরঘরের বারান্দায় গণ্‌শুকে টানিয়া তুলিয়া ঠাকুমা নিজের আঁচলে তাহার মাথা এবং হাতা-পা মোছাইয়া দিলেন,—তারপরে নিজের কাপড়ের নীচ হইতে একটা জামা-প্যাণ্ট বাহির করিয়া ভিজা কাদামাখা জামা-প্যাণ্ট ছাড়াইয়া সেই শুকনো জামা-প্যাণ্ট পরাইয়া ঘরে লইয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে ঠাকুমা পাঁচবার তাঁহার মাথার দিব্যি দিয়া বলিলেন,—'আমার মাথা খাস্ গণ্‌শু—আজ তুই এখন গিয়ে গদরামি করতে বসিস নে—ঘুমিয়ে পড়িস নে—আজ একটু গিয়ে বই নিয়ে বস—'

হাঁটিতে হাঁটিতে গণ্‌শু বলিল,—'তোমার একটা শুকনো সাদা মাথা আর তুমি কতদিন খাওয়াবে ঠাকুমা!'

'এক দিনে তুই খেয়ে ফেল,—"তুইও বাঁচিস্, আমিও বাঁচি।"

'ঘরে ঢুকিয়া গণ্শু দেখিল, বোন হিমি তাহার হারিকেন লণ্ঠনটা ধরাইয়া দিব্যি হাতের লেখা লিখিতে বসিয়া গিয়াছে। হারিকেন গণ্শুর জন্যই কেনা, এবং এ-বস্তুটির উপরে তাহার একাধিপত্য সম্বন্ধে গণ্শু খুব সচেতন। ঘরের অন্যান্য কাজ কেরোসিনের কুপি বা মাটির প্রদীপেই চলিত এই হারিকেন বাতিটির প্রতি হিমির বড় একটা লোভ এবং তাহা লইয়া দাদার প্রতি প্রচণ্ড ঈর্ষ্যা ছিল; কিন্তু বাঘের মতন ভয় পায় সে দাদাকে; আজ দাদার অনুপস্থিতি দেখিয়াই লণ্ঠনটি জ্বালাইয়া লইয়া বসিয়াছিল। গণ্শু মিলিটারি মেজাজে ঘরে ঢুকিয়া সোজা হিমির কাছে গেল, তাহারর চুলের মুঠি ধরিয়া সজোরে একটা টান দিয়া গণ্শু নীরবে হারিকেন বাতিটি টানিয়া লইয়া গেল। ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন,—'তোরও আর সখ দেখে বাঁচিনে হিমি—রোজ তোকে বারণ করি দাদার লণ্ঠন ধরতে—তবু তোর ঐ লণ্ঠন না হলে চলবে না! জানিস না—এবার দাদার পরীক্ষার বার?' ব্যথায় ক্রোধে আপমানে হিমি আর মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিল না, পাশের বিছানার বালিসগুলির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া সটান শুইয়া রহিল।

হারিকেন বাতিটা লইয়া গণ্শু তাহার পড়ার টেবিলে গিয়া একসঙ্গে অনেকগুলি বই মেলিয়া লইয়া বসিল। তাহার এই টেবিলটি তাহার নিজেরই তৈরী। বাঁশের খুঁটির উপরে সুপারীর ভারা বাঁধিয়া এটি তৈরী হইয়াছে। পনের বিশ মিনিট ইহার উপরে ঝুঁকিয়া থাকিয়া হঠাৎ গণ্শু জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিয়া বলিল,—'হিমি, রান্নাঘরে

দেখে আয় ত রান্না হয়েছে কিনা—।' হিমি কোনও উত্তর করিল না, একটু নড়িলও না। উত্তর করিলেন ঠাকুমা,—'এই না তুই পুঁথিপত্তর নিয়ে বসলি,—এর মধ্যেই তোর ফুস্‌-মন্তোর হয়ে গেল? তোর পরীক্ষা যে এসে গেল—সাতপুরুষের মুখে পিণ্ডি দিয়ে আর দু'টো পাতা একটু ওল্‌টা না রে বাপু।'

মুখ খিঁচাইয়া গণ্‌শু বলিয়া উঠিল,—'আঃ—সেই পরীক্ষা—পরীক্ষা—পরীক্ষা—দিনরাত্তির ঘ্যানর ঘ্যানর সেই এক কথা; ক্ষিদের জ্বালায় মরব নাকি সেই পরীক্ষার জন্যে?' বলিয়া গণ্‌শু তাহার টেবিল ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। ছড়ানো বই কয়টা ঠাস্‌ ঠাস্‌ করিয়া একটার উপর একটা রাখিয়া গণ্‌শু সোজা চলিয়া গেল রান্নাঘরে। টের পাইয়া হিমি তাড়াতাড়ি গিয়া পট্‌ করিয়া হারিকেনটি নিভাইয়া দিয়া আবার যেমন ছিল, ঠিক তেমনি বালিসের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া রহিল।

রান্নঘরে গিয়া গণ্‌শু মাকে বলিল—'ক্ষিদে পেয়েছে, খেতে দাও।' বলিয়াই একখানি পিঁড়ি পতিয়া নিজেই সে রান্নাঘরের খুঁটিতে টেস দিয়া বসিয়া পড়িল। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত মায়ের ভাত খাইতে দিবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। গণ্‌শু এবারে চ্যাচাইয়া বলিয়া উঠিল,—'ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত দাও।'

মা অতি রুক্ষ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—'সারা দিন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে রাতে ঘরে এসে ষাঁড়ের মতন চ্যাচাবি নে ব'লে দিচ্ছি। পড়া তৈরী না হলে ভাত নেই।'

গণ্‌শু বলিল,—'পড়া তৈরী হয়েছে কিনা তুমি জান?'

মা বলিলেন, —'জানি বৈ কি! রোজই সন্ধ্যে হতে না হতে

তোর সব পড়া তৈরী হয়ে যায়,—আর পরীক্ষার খাতায় খালি লাড্ডু—!'

'কে বলেছে?'—পিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করে গণ্শু।

'বলেছে ওপাড়ার সতু মাস্টার। গত পরীক্ষায় পাঁচ পাঁচটা পেয়েছিস্ লাড্ডু আবার মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করে না?'

'কে বলেছে? সতু মাস্টার? দেখে নেব আমি সতু মাস্টারকে, ক'দিন আর এ গাঁয়ে মাস্টারি করে। বাড়ি থেকে ইস্কুলে আসবার পথে এক গলা জল, বাঁশের সাঁকো বেঁধে দিয়ে এসেছি আমি, পাড়ার ছেলেদের নিয়ে তিন ঘণ্টা ডুবিয়ে ডুবিয়ে। কাল সকালেই আমি গিয়ে আবার সে সাঁকো ভেঙ্গে দিয়ে আসব,—তারপরে আবার পরনের ফিন্‌ফিনে ধুতি খুলে মাথায় পাগড়ি বেঁধে গামছা প'রে সাঁতার কেটে রোজ ইস্কুলে আসতে হবে।' —বলিয়াই গণ্শু রান্নাঘর ছাড়িয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া সে সোজা একটা সরু চাটাই বিছানো চৌকির উপরে শুইয়া পড়িল। ক্ষুধায় সে আজ সত্যই কাতর; খেলাতেও বড় ক্লান্ত। সুতরাং শুইয়া পড়িবার দুই-তিন মিনিটের মধ্যে সে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

বর্ষাকালে এ অঞ্চলে বড় সাপের ভয়, তাই প্রতিবার খুব ঘটা করিয়া বারোয়ারী মনসা পূজা দেওয়ার উদ্যোগ হয়, উদ্যোগী থাকেন গণ্শুর বাবা শ্যামাকিঙ্কর। সেই পূজা ব্যপদেশেই পাঁচমাইল দূরের হাটে গিয়াছিলেন শ্যামাকিঙ্কর পাড়ার সব লোকজন লইয়া, ফিরিয়া আসিতে রাত চারি দণ্ড হইয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া শ্যামাকিঙ্কর গণ্শুর খোঁজ করিলে, হিমি সোৎসাহে দৌড়াইয়া আসিয়া বলল,—

'দেখবে এস বাবা,—দাদা পড়াশুনো কিছু না ক'রে সন্ধ্যা যেতে না যেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।' শ্যামাকিঙ্কর আগাইয়া যখন দেখিলেন, গণ্শু সত্যই ঘুমে অচেতন, তখন আর কোনও কথা না বলিয়া তাহার কান দুইখানি ধরিয়া তাহাকে একেবারে সোজা শূন্যে ঝুলাইয়া ধরিলেন এবং সেইভাবেই তাহাকে লইয়া গিয়া তাহার পড়ার টেবিলের কাছে দিয়া বলিয়া দিলেন যে, রাত বারটার মধ্যে সে যদি একটিবারের জন্যও ঝিমাইয়া পড়ে, তবে নাকে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে ঘরের আড়কাঠের সহিত ঝুলাইয়া দেওয়া হইবে।

দেখিতে দেখিতে আর ছয়টি মাস কাটিয়া গিয়া পরীক্ষার তারিখ সত্যই ঘনাইয়া আসিল। স্কুলের টেস্ট-পরীক্ষায় গণ্শু যথারীতি আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে নির্বিঘ্নে ডাহা ফেল করিয়া বসিয়া আছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রথমটায় গণ্শুকে কিছুতেই পরীক্ষার জন্য পাঠাইতে রাজি হন নাই ; কিন্তু শেষে গ্রামের বহু বাসিন্দা একযোগে আসিয়া যেদিন শাসাইয়া গেল যে, শ্যামাকিঙ্কর গ্রামের গণ্যমান্য মাতব্বর মানুষ, তাঁহার ছেলে গণ্শুকে যদি পরীক্ষা দিতে না পাঠান হয়, তবে আর তাঁহাকে এই গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারি করিতে হইবে না, সেদিন শুধু চাকুরির ভয়ে নয়, প্রাণের ভয়েও তাঁহাকে গণ্শুর নামটি পরীক্ষার্থীদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইল। কিন্তু গণ্শুর পিছনে এই প্রধান শিক্ষকসহ কতিপয় শিক্ষক যেন একেবারে যমদূতের ন্যায় লাগিয়া গেলেন। বাড়িতে ঠাকুমাও মালা হাতে করিয়া প্রায় দিনরাতই গণ্শুকে পরীক্ষা-মন্ত্র জপ করাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। মা দুইবেলা খাইতে শুইতে মিষ্টি-কটু উভয় রসে মিশ্রিত করিয়াই সেই পরীক্ষার কথা শুনাইতেছেন। বাবা বলিয়া

দিয়াছেন, এই প্রথম পরীক্ষায়ই যদি ফেল করে, তবে আর গণ্শুকে এই বাড়িতে ঢুকিতে হইবে না। মামা সেদিন আসিয়া লোভ দেখাইয়া গিয়াছে, পরীক্ষায় যদি গণ্শু কোনও রকমে একটা পাস দিতে পারে, তবে তাহাকে সে কলিকাতায় লইয়া গিয়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিবে।

কিন্তু গণ্শু যে চারিদিকে শুধ্ অকূল-পাথার দেখিতেছে! তাড়নায় তাড়নায় আজকাল আর সে স্কুলে মাস্টারদের কাছেও যায় না, বাড়িতেও থাকে না—পাশের বাড়ির ফক্কার সহিত পড়িতে যাইবার নাম করিয়া দুই-একখানা বই লইয়া বাহির হইয়া যায়, এবং কেউ দেখিতে না পায় এমন ভাবে বড় দীঘির কোণে তেঁতুল গাছের নীচে একা একা গিয়া বসিয়া থাকে। পরীক্ষা—পরীক্ষা—পরীক্ষা! খেলা ত এখন মাথায় উঠিয়াছে, নিশ্চিন্তে যে একটু খাইবে শুইবে তাহারও কোন উপায় নাই, সবাই মিলিয়া তাহাকে রীতিমত পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

বসন্তের ঝির্ঝির হাওয়া দিতেছে। তেঁতুলতলায় বসিয়া গণশুর চোখ কেমন ঝিমু ঝিমু করিতেছে—সেই ঝিমের মধ্যেই গণ্শু স্বপ্ন দেখিতেছে, চারিদিক হইতে বহু লোক যেন মালকোঁচা দিয়া একত্র হইয়াছে, তাহারা একসঙ্গে আগাইয়া আসিয়া গণ্শুর হাত-পা বাঁধিয়া তাহাকে একটা নীল সমুদ্রের তুফানের মধ্যে খালি চুবাইয়া দিতেছে! চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—সমুদ্রের মাঝখানে অতি বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "পরীক্ষা"।

হঠাৎ একটা খচ্খচ্ শব্দে চোখ মেলিয়া গণ্শু দেখে তেঁতুলতলার পাশের জুলিপথ দিয়া যাইতেছে ঘোষাল বাড়ির পঞ্চা। গণ্শু ডাকিয়া বলিল—'কিরে পঞ্চা, কোথায় যাচ্ছিস্—তোর হাতে কি?'

পঞ্চা বলিল, —'হাতে ধুতুরা ফুল।'

'কেন, এত ধুতুরা ফুলে কি হবে রে?'

'তারকেশ্বরের মহাদেবের পূজোয় লাগবে।'

'কে যাচ্ছে রে পূজো দিতে?'

'শুধু পূজো নয়, একেবারে হত্যা দিতে।'

'হত্যা দিতে? কে যাবে?'

'আমার পিসিমা।'

'তোর পিসিমা? কেন রে?'

'কেন? এই ত অসুখে ভুগে ভুগে চোখে এখন আর তেমন দেখতে পাচ্ছেন না, কানে শুনছেন না, —কিন্তু আসল হ'লে তাঁর সেই পেটের শূল। যখন সেই শূলের ব্যথা ওঠে—তখন আর কিছুতেই সুস্থ হতে পারেন না, ভিরমি দিয়ে প'ড়ে কাটা পাঁঠার মতন খালি দু'হাত-পা তুলে ছাটাতে থাকেন, আর চীৎকার! ডাক্তার-কবরেজ ত কিছুই বাকি নেই—এবার পিসিমা নিজে যাবেন বাবা তারকেশ্বরের কাছে পূজো-অর্চা দিয়ে শেষে হত্যা দিয়ে থাকতে।'

পঞ্চার খুব কাছে আগাইয়া আসে গণ্শু, বলে,—'হ্যাঁরে, বাবা তারকেশ্বরের কাছে হত্যা দিলে কি হয়?'

পঞ্চা গম্ভীরভাবে বলে,—যার যা মনোবাসনা সব সিদ্ধ হয়।'

'সত্যি বলছিস্?'

সত্যি নয় ত দেবতা নিয়ে কি খেলা?'

নিরাশ্রয়ের আশ্রয় বাবা তারকেশ্বর,—গণশুর মনটা কেমন ছট্‌ফট্ করিয়া ওঠে। সে পঞ্চার হাতটা টান দিয়া বলিল,—'আমিও যাব তোর পিসিমার সঙ্গে পঞ্চা!'

'কেন? কেন?'

'সে আছে—চল্ তোদের বাড়ি যাই।'

ঘোষাল বাড়ির পঞ্চার বাবা মধু ঘোষালের মত লইয়া কথাটা গণ্শু যখন বাড়িতে আসিয়া ঠাকুমাকে বলিল, ঠাকুমার কথাটা মন্দ লাগিল না। ঠাকুমাই ডাকিয়া গণ্শুর মাকে বলিলেন, মা আবার গিয়া খোদ শ্যামাকিঙ্করের কানে তুলিলেন। খানিকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারও মনে হইল, মন্দ কি, যাক্ না, দিয়া আসুক একবার পূজা-আর্চা বাবা তারকনাথকে—কোনও রকমে যদি পাসটা করিতে পারে ত একটা হিল্লে হয়। নিজেই তিনি মধু ঘোষালের বাড়ি গিয়া কথাটা পাড়িতে মধু ঘোষাল হাসিয়া বলিলেন—'স্বচ্ছন্দে যেতে পারবে গণ্শু—তোমার কোন ভয় নেই। এই আজকার গাড়ীতে গিয়ে পৌঁছব। কালকের দিনটা আর রাতটা থাকব, পরশু সকালবেলা আবার পূজো দিয়ে চলে আসব। তোমার ছেলে তোমার হাতে হাতে পৌঁছে দেব।'

শেষ পর্যন্ত সত্য সত্যই গণ্শু মধু ঘোষাল আর তাঁহার রুগ্না বোনের সঙ্গে তারকেশ্বরে চলিয়া গেল।

তারকেশ্বরে গিয়া মধু ঘোষাল পড়িল সে এক মহা বিপদে। কোথা হইতে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন এক অদ্ভুত গোঁয়ার গোবিন্দ—সে মিষ্টি কথায়ও মানে না, কটু কথায়ও টলে না, রাগ করিলে ভয় পায় না! সকালবেলা বাবা তারকেশ্বরের পূজা-আর্চা শেষ করিয়া মধু ঘোষালের বোন যখন 'হত্যা' দিয়া পড়িল—তখন গণ্শুও জিদ্ করিল, সেও সারাটি দিনরাত অমনি পিসির সঙ্গে 'হত্যা' দিয়া পড়িয়া থাকিবে। মধু ঘোষাল এবং তাহার

বোন কোন কিছুতেই গণ্শুকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিল না। সেও পিসির কাছেই সটান সারাটা দিন পড়িয়া রহিল,—অনেক সাধ্য-সাধনায় দুই বার দুই ঢোক জল মাত্র তাহাকে খাওয়ান গিয়াছে।

দিনটা কোনও রকমে কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাত্রিটায় গণ্শুর কেমন একটা ভয়-ভয় করিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর হইতে আস্তে আস্তে লোকজন সব চলিয়া গিয়া চারিদিকটা কেমন নির্জন হইয়া গিয়াছে, পাশে মুখ সিঁটকাইয়া পড়িয়া আছে পঞ্চার পিসি, বাঁচিয়া আছে কি না তাহাও বুঝিবার উপায় নাই। এদিকে সারাদিনের উপবাস—সারা গাটা শুধু শিথিল নয়, কেমন যেন ছম্ছম্ করিতেছে। রাত যখন এক প্রহর কাটিয়া গিয়াছে, তখন প্রায় সবই নিঝুম—শুধু মধু ঘোষাল এদিক-ওদিক ঝুঁকিয়া পড়িয়া ঝিমাইতেছেন। গণ্শুর সহসা মনে হইতে লাগিল আস্তে আস্তে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিতেছে—ভীষণ অন্ধকার—সে অন্ধকারের মধ্যে মন্দির-দেবতা, ঘর-বাড়ি, পঞ্চার পিসি—মধু ঘোষাল সব কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে। গণ্শু কোথায় আছে, সে নিজেই ঠিক করিতে পারিল না। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে গণ্শু সহসা পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল—কে যেন খড়ম পায় দিয়া আসিতেছে। প্রথমে কান খাড়া করিয়া শুনিল—তারপরে চোখ খুলিয়া দেখিল—হ্যাঁ, সত্যই ত—এই লম্বা প্রকাণ্ড চেহারা, খড়ম পায়ে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা—মাথায় ঝুঁটিবাঁধা জটা—কালো কুচকুচে—গণ্শুর দিকেই আগাইয়া আসিতেছে। গণ্শুর মুখ শুকাইয়া শরীর ভয়ে ফুলিয়া উঠিতেছিল,—কিন্তু কি করিবে? কোথাও যাইবার কোনও পথ দেখিতেছে না, কোথাও

কোনও লোকজন দেখিতে পাইতেছে না—সব অন্ধকার—এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যেই যেন ঈষৎ একটু আলোর আভাস—তার মধ্যেই ভীষণ পুরুষ। কিন্তু গণ্‌শু তাহাকে দেখিয়া যত ভয় পাইয়াছিল, তাহার কথা শুনিয়া ততই মনে বল পাইল। অতি স্নেহকণ্ঠে সেই বিরাট পুরুষ কাছে আসিয়া গণ্‌শুকে বলিলেন,—'কি হে বাছা, তুমি এখানে এমন ক'রে প'ড়ে রয়েছ কেন? তুমি কি চাও?'

সাহস পাইয়া সেই বিরাট পুরুষকে প্রণাম করিয়া গণ্‌শু বলিল,—'আপনি কি বাবা তারকেশ্বর?'

সেই বিরাট পুরুষ হাসিয়া বলিলেন,—'না, আমি বাবা তারকেশ্বর নই, আমি তাঁর ভৈরব; বাবা তারকেশ্বরই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তুমি এখানে কি চাও?'

গণ্‌শু করজোড়ে বলিল—'বাবা ভৈরব—এবার যে আমার পরীক্ষা।'

'কি পরীক্ষা?'

'বাবা, স্কুলের শেষ পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় এবারে পাস করতে পারলে ক'লকাতা গিয়ে মামার বাড়ি থেকে কলেজে পড়তে পারব,—আর পাস না করতে পারলে বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন—।'

'পরীক্ষায় ফেল করবে কেন?'

'আমার যে পড়াশুনা কিছুই হয়নি।'

'তা হ'লে আমরা কি করতে পারি? বাবা তারকেশ্বরের কাছে তুমি কি চাও?'

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কয়েকবার ঢোক গিলিয়া গণ্‌শু বলিল,—'এবারের প্রশ্নগুলো একটু আমাকে বলে দিতে হবে।'

ভৈরব হাসিয়া বলিলেন,—'তা কি কখনও হয় ?'

গণ্শু ভৈরবের তুইটি পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—'তা একবার বলতেই হবে, নইলে আমি ছাড়ব না কিছুতেই।'

'আচ্ছা দেখছি, দেখছি—' বলিয়া ভৈরব পা ছাড়াইয়া লইলেন। তার পরে বলিলেন—'আচ্ছা, তুমি এখানেই একটু অপেক্ষা কর—আমি একবার বাবা তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখা ক'রে কথা ব'লে আসি।' এই বলিয়া লম্বা লম্বা পা বাড়াইয়া ভৈরব চলিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট পরেই ভৈরব হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'না' তোমার উপরে বাবা তারকেশ্বর দেখছি আজ খুব সদয়; এই নাও—এই এবারের সব প্রশ্নপত্র—সব তোমার কাছে রেখে গেলাম। ঠিক এক ঘণ্টা সময় পাবে, এর ভিতরে যতটা পার দেখে নাও। আমি একঘণ্টা পরে এসে আবার সব ফিরিয়ে নিয়ে যাব। আর এই তোমার মাথায় হাত রেখে গেলুম—এতে ক'রে তুমি অন্ধকারেই এসব প্রশ্ন পড়তে পারবে।' বলিয়া ভৈরব আবার অন্তর্ধান হইলেন।

গণ্শু সহসা কিছুই দিশা করিতে পারিতেছে না, এটা ছাড়িয়া ওটা পড়ে, আবার ওটা ছাড়িয়া এটা পড়ে—আর মনে দারুণ ত্রাস—এই বুঝি একঘণ্টা হইয়া গেল, এই বুঝি ভৈরব আসিয়া সব ছিনাইয়া লইয়া যায়! কিন্তু কি বিপদ্—প্রশ্নপত্রগুলি সে এদিক ওদিক করিয়া কতবার কতরকম পড়িতেছে, কিছু মনে রাখা ত দূরের কথা, একটি কথাও যে তাহার মাথায় ঢুকিতেছে না! কতবার কত রকম করিয়া সে চেষ্টা করিতেছে—কিন্তু মনে হইতেছে, তেমন কিছুই বুঝিতেছেও না, মনেও রাখিতে পারিতেছে না। তবে? তবে কি



এমন করিয়া হাতে পাইয়াও সব জিনিস সে হারাইবে? মাথাটা বার বার করিয়া ঠুকিতে ইচ্ছা হইতেছে গণ্শুর শক্ত মেঝেটার উপরে; কিন্তু কি লাভ হইবে তাহাতে? আগে যদি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিত সে যে, সত্য সত্যই এত দয়া হইবে তাহার উপরে বাবা তারকেশ্বরের, তবে কি আর সে এমন করিয়া খালি হাতে আসিত? তাহা হইলে ত খাতা পেন্সিল লইয়া প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারিত এবং টকাটক সব টুকিয়া লইতে পারিত।

নিমেষের মধ্যে যেন একঘণ্টা কাল চলিয়া গেল,—সেই কালো বিরাট পুরুষ খড়ম পায়ে আবার আসিয়া উপস্থিত—বলিলেন—'দাও, সব কাগজপত্র ফিরাইয়া দাও।'

গণ্শু তাহার গায়ে যতখানি জোর আছে ততখানি জোর দিয়া ভৈরবের দীর্ঘ পা দুইখানি আবার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিল, বলিল, 'বাবা, আমার কিছুই হয় নাই, আর কিছু সময় আমাকে দিতেই হবে।'

'কত সময়?'

'অন্ততঃ দুইঘণ্টা।'

'কেন, এত সময়ে তুমি কি করবে?'

'যেমন ক'রে হোক, আমি একটা খাতা-পেন্সিল যোগাড় ক'রে সব জিনিসটা একবার টুকে নেব,—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবা, আর কোনও কাকপক্ষীকেও আমি জানতে দেব না কিছুই।'

মাথা নাড়িয়া ভৈরব বলিলেন,—'না, তা হয় না বাছা,—বাবা তারকেশ্বরের তাতে নিষেধ। তিনি ব'লে দিয়েছেন, তুমি প'ড়ে বু'ঝে যদি মনে করে নিতে পার ত নাও—টুকে নিয়ে যেতে তিনি কিছুতেই দেবেন না।'

ভৈরবের লিকলিকে পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া গণ্‌শু বলিল,—'তবে এই পা আমি আর কিছুতেই ছাড়ব না।'

দয়া হয় ভৈরবের গণ্‌শুর উপরে, আহা বেচারার পাস করিবার কি নিদারুণ বাসনা। নিজের দায়িত্বেই ভৈরব বলিলেন,—'আচ্ছা, আর দু'ঘণ্টা সময় তোমাকে দিলুম।' বলিয়াই আবার অন্তর্ধান।

ভৈরব চলিয়া যাইতেই গণ্‌শু পাগলের মত উঠিয়া পড়িল—কোথা হইতে আসিল গায়ে এত বল—মনে এত সাহস! অন্ধকারেই রাস্তা ধরিয়া সে ছুটিল—রাস্তার দু'পাশে এত ঘরবাড়ি দোকানপাট—কোথাও কি একটু কাগজ-পেন্সিল মিলিবে না? কিন্তু এই দুপুর রাত্রে এই বিভূঁই বিদেশে কাহাকে সে ডাকিয়া তুলিবে? প্রশ্নপত্র-গুলিও যে হাতের মুঠার মধ্যেই রহিয়াছে—তাহাও যদি কেহ দেখিয়া ফেলে? তবে ত আর রক্ষা নাই—ভৈরবের হাতের সেই ভীষণ ত্রিশূলটির কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। গণ্‌শু রাস্তার ধারের একটা ঘরের পাশে গিয়া দাঁড়ায়—কান পাতিয়া ঘরের মধ্যে কি আছে অনুভব করিতে চেষ্টা করে, একবার ডাক দিবে বলিয়া ভাবে, একবার দুয়ারে সজোরে ধাক্কা দিতে আগাইয়া যায়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই করিতে না পারিয়া আর একটা ঘরের দিকে চলিয়া যায়। এমনি খানিকক্ষণ ছুটাছুটির পর একটা ঘরের দুয়ারে সে সহসা সত্য সত্যই আঘাত করিয়া বসিল। উত্তেজনার আধিক্যে ধাক্কাটা হঠাৎ বড্ড বেশি জোরে হইয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে একসঙ্গে চারি-পাঁচজন লোক 'কে—কে' বলিয়া ধড়্‌মড় করিয়া জাগিয়া উঠিল। ভয় পাইয়া গণ্‌শু পাশের গলিটার

মধ্যে দৌড়াইয়া পলাইল। বেশী দূর যাইবার সাধ্য কি? ঘরের লোকজন জাগিয়া দুয়ার খুলিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া 'চোর চোর' বলিয়া সমস্বরে এবং তারস্বরে এমন চিৎকার জুড়িয়া দিয়াছে যে, দেখিতে দেখিতে হুড়মুড় করিয়া পাড়ার সব লোকজন জাগিয়া উঠিয়া এদিক ওদিক হইতে হল্লা করিয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল। গণ্শু আর কোনও উপায় না দেখিয়া পথের এক কোণে একটা খালি পিপা দেখিতে পাইয়া একলাফে তাহার মধ্যে ঢুকিয়া লুকাইয়া রহিল। লোকজন সব লণ্ঠন ধরাইল, চ্যাঁচামেচি করিল, এদিক সেদিক খানিকটা খুঁজিয়া দেখিল—তারপর আবার যে যাহার ঘরে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। সব আবার অন্ধকার নিজ্‌ঝুম হইলে গণ্শু সেই পিপার ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, বুকটা আবার শুধু ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। না—মরিতে মরিতে সে বাঁচিয়া গিয়াছে কোনও রকমে। আর কাজ নাই খাতা-পেন্সিলে—আবার গুটি-গুটি পা চালাইয়া সে বাবা তারকেশ্বরের মন্দিরের দিকেই চলিয়া গেল। সেখানে গিয়া আবার সে সবগুলি কাগজপত্র পড়িয়া বুঝিয়া মনে রাখিবার চেষ্টা করিল—দেখিল, পড়া যতবার ইচ্ছা যাইতে পারে, কিন্তু বুঝিয়া মনে রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল।

যথাসময়ে ভৈরব আসিয়া উপস্থিত হইতে গণ্শু আর কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া প্রশ্নপত্রগুলি সবই ভৈরবের হাতে ফিরাইয়া দিল; ভৈরব হাসিয়া বলিলেন,—'দেখ বাবা, আমরা সর্বজ্ঞ, তোমার মনের কথা সবই জানি। তোমার সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বাবা

তারকেশ্বরের সঙ্গে কথা বললাম,—তিনি তোমাকে বলে দিতে বললেন, এখানে তোমার কিছুই সুবিধে হবে না।'

গণ্শু বলিল,—'তবে কোথায় গেলে হবে?'

ভৈরব বলিলেন,—'শোন, তুমি ছেলেমানুষ, তাই সব কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। সর্বপ্রধান দেবতা হলেন তিন জন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। বাবা তারকেশ্বরই হলেন স্বয়ং মহেশ্বর, তাঁকে দিয়ে দেখা গেল, তোমার কোনও কাজ হ'ল না। তিনিই তোমাকে পরামর্শ দিতে ব'লে দিলেন, তুমি অপর দুই দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কাছে যাও।'

গণ্শু বলিল,—'তাঁদের কাছে গিয়ে কি হবে?'

ভৈরব বলিলেন,—'জান ত, ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা, আর বিষ্ণু হচ্ছেন পালনকর্তা। তাঁদের ভিতরে ব্রহ্মাকে গিয়ে বল তোমার মাথার ভিতরকার মগজের সামান্য একটু অদল-বদল ক'রে—একটু নোতুন ক'রে সৃষ্টি ক'রে দিতে—আর বিষ্ণুকে গিয়ে বল, ব্রহ্মা তোমার মাথাটিকে এখন যেমন ক'রে তৈরী ক'রে দিচ্ছেন, অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সেটা যেন বিগড়ে না যায়, এমনভাবে পালন ক'রে রাখতে,—তবে দেখবে আর তোমার কোনও পরীক্ষায়ই পাস করতে আটকাবে না।' এই বলিয়াই ভৈরব আবার যেন অন্ধকারেই বিলীন হইয়া গেলেন।

পাশে কাহার বার বার ঠেলা খাইয়া গণ্শুর ঘুম ভাঙিয়া গেল—চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখে, মধু ঘোষাল ঠেলিয়া তাহার ঘুম ভাঙাইতেছেন—বলিতেছেন—কি ঘুম তুই সারারাত ঘুমোচ্ছিস্‌রে গণ্শু—ডেকে ডেকে তোকে জলটুকুও খাওয়াতে পারলুম না। নে—

এইবারে ভোর হয়ে গেছে—আর কাজ নেই,—এইবারে চোখে মুখে একটু জল দিয়ে এই সন্দেশটা আর এই গ্লাসের জল খেয়ে ফেল দেখি'—বলিয়াই মধু ঘোষাল গণ্শুর কাছে এক ঘটি মুখ ধোবার জল—এক ঠোঙা মিষ্টি এবং এক গ্লাস খাবার জল আগাইয়া দিলেন। গণ্শুর সর্বশরীর কেমন ঝিন্‌ঝিন্ করিতেছিল, মাথাটা যেন কেমন গরম হইয়া গিয়াছে—জলে ভর্তি গ্লাসটা হাতে লইয়া ঢক্‌ঢক্ করিয়া এক নিঃশ্বাসে সবটা জল খাইয়া ফেলিল; পাশে চাহিয়া দেখিল, পঞ্চার পিসি এতক্ষণে কোনও রকমে উঠিয়া বসিয়া মালা জপ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে।

———



এবারে বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া রায়দের বাড়ি যে তিন পালা যাত্রা গান হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে যে জিনিসটি বুড়ন-তলার ছেলে-বুড়ো সকলের মন সর্বাপেক্ষা বেশী আকর্ষণ করিয়াছে, এবং যে জন্য বিষ্টু-পালের যাত্রাদল ঐমুলুকে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে তাহা এই যে – 'মহিষাসুরবধ' যাত্রাভিনয়ে যে ব্যক্তি মহিষ সাজিয়া চণ্ডী-দেবীর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিল, স্টেইজের উপরে কেহই তাহাকে মহিষ না বলিয়া মানুষ বলিয়া চিনিতে পারে নাই। ঘোঁ ঘোঁ গর্জন করিতে করিতে ঘন ঘন শিং নাড়াইয়া সে যখন আসিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল, তখন ছেলের দল উঠিয়া দিল দৌড়– মেয়েরা ভয়ে থরহরি, বৃদ্ধগণও মানিলেন বিস্ময়! তারপরে চণ্ডী এবং মহিষের সেই যুদ্ধ— চণ্ডীর ঝক্‌ঝকে ধারাল খড়গদ্বারা মহিষকে আঘাত আর রক্তাক্তদেহে

মহিষের চোঁচা পলায়ন—সকলই অবাক্ কাণ্ড! দেখিয়া শুনিয়া সকলে বলিল,—সাবাস্ সাবাস্—গান বটে।

তারপর হইতে আজ প্রায় মাসাধিক কাল ধরিয়া ঘোতন, পঞ্চু, ভূতো, কেষ্টা, বীরু প্রভৃতি রায়দের শিমুলতলায় বসিয়া দিনরাত্রি চলিতেছে সেই গানের আখড়াই। সেই চণ্ডী—সেই মহিষ—সেই গর্জন—যুদ্ধ আঘাত,—তারপরে ছেঁড়া চটি হস্তে রায় মহাশয়ের তাড়া খাইয়া চণ্ডী এবং মহিষের একযোগে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন!

ব্যাপারটা হইল এইরূপ ঃ—

একদিন পঞ্চু অতি উৎসাহে প্রস্তাব করিল যে, শিমুলতলা একটা স্টেইজ করিয়া তাহারাও একদিন, 'মহিষাসুরবধ' যাত্রাভিনয় করিবে, পাড়াপ্রতিবেশী সকলকে যেমন করিয়াই হোক জড় করিতে হইবে,—আর সর্বপ্রধান কথা হইল এই যে, বিষ্টুপালের মহিষের অপেক্ষা তাহাদের মহিষটি যেন কোন রকমেই নিকৃষ্ট না হয়। কথাটা হইতে না-হইতেই উপস্থিত অভিনেতাদের ভিতরে একটা ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ভূতো আপনা-আপনি কয়েকটা পাক খাইয়া ধপ্ করিয়া ঘোতনের কাঁধে চাপিয়া বসিল,—সহসা অতটা ভর সামলাইতে না পারিয়া ঘোতন মারিল এক থাপ্পড়—তাহা লইয়াই প্রায় একটা খণ্ড যুদ্ধ!

উৎসাহের মত্ততা একটু কমিয়া আসিলে পর পঞ্চু বলিল যে, সব চেয়ে আসল কথা হইল মহিষ। মহিষ সাজিবে কে? কেষ্টার কালো বৃহদাকার দেহটির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভূতো প্রস্তাব করিল যে, মহিষের যোগ্যতম ব্যক্তি কেষ্টা। কেষ্টা চটিয়া-মটিয়া প্রত্যুত্তর দিল যে, ভূতো যদি এইরূপ প্রস্তাব তৎক্ষণাৎই

ফিরাইয়া না লয়, তবে তাহার লম্বা নাসিকার উপর সে ইচ্ছা করিলে একটা ঘুষি মারিতে পারে। অবশ্য কেষ্টা যে একটি সজোরে ঘুষির সাহায্যে অনেক কিছুই করিতে পারে, সে বিশ্বাস উপস্থিত সকলেরই ছিল ; সুতরাং ভূতো বেশী বাড়াবাড়ি না করিয়া তাহার প্রস্তাবটি ফিরাইয়া লইল।

তখন পঞ্চু তাহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিল যে, এই অভিনয়ে যে মহিষ সাজিবে তাহারই সম্মান সর্বাপেক্ষা বেশী ; কারণ সমস্ত অভিনয়ের ভিতরে মহিষটিই হইল আসল জিনিস, সকলেই আসিবে মহিষ দেখিতে, সুতরাং মহিষ সাজিতে কাহারও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সকল দিক্ ভাবিয়া কেষ্টার মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হইল, এবং সে বলিল যে, মহিষ সাজিতে তাহার বিশেষ কোন আপত্তি নাই ; তবে ভূতো যদি তাহার শরীরের গঠন বা রং সম্বন্ধে কোনওরূপ অপমান-জনক ইঙ্গিত করে, তবে তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। অবশেষে ভূতোর প্রতি কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ঠিক হইল—কেষ্টাই মহিষ সাজিবে এবং পঞ্চু নিজে দেবী সাজিবে। শুভ কাজ শীঘ্রই হওয়া ভাল,—আগামী কল্য বৈকালেই অভিনয়ের সময় ধার্য হইল।......

আজ অভিনয়। আয়োজনের আর কিছুই ত্রুটি নাই। রায়দের প্রকাণ্ড শিমুলগাছের তলায় স্টেইজ বাঁধা হইয়াছে। বিকালবেলা বেশ গাছের ছায়াই পড়ে,—তাই উপরে আর আচ্ছাদনের দরকার হইল না ; নিচে বসিতে দিবার জন্য ঘোতন শিববাড়ির বুড়ো পিসিকে গুড়ের মত মিঠা পাঁচটা চাল্‌তে খাওয়াইবার লোভ দেখাইয়া, বাড়ির

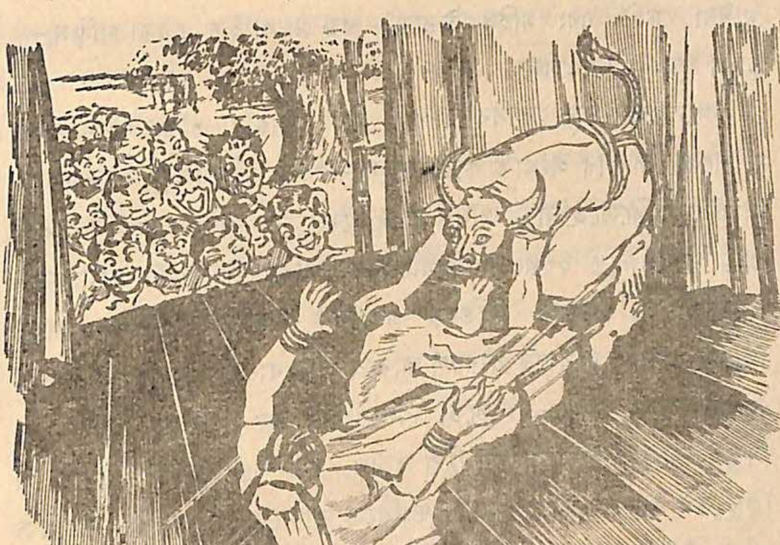
কর্তাদের অজ্ঞাতে তাঁহাদের ছেঁড়া সতরঞ্চখানি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। হাটখোলার বৃন্দাবনকে বলা হইয়াছে যে, সে যদি অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যেও বিড়ি লইয়া রায়দের শিমুলতলার এক পাশে গিয়া দোকান পাতে, তবে তাহার তোত্‌লামির জন্য স্কুল হইতে ফিরিবার পথে তাহারা আর তাহাকে ভেঙাইবে না। অগত্যা বৃন্দাবন রাজি হইয়াছে।

দুপুর হইতেই পাড়ার সকল ছেলেমেয়ে রায়দের শিমুলতলায় জড় হইয়াছে; সকালবেলা ভূতো গিয়া পাড়ার ছেলেমেয়েদের ভিতরে শমনজারি করিয়া আসিয়াছে যে, আজিকার অভিনয়ে যে সকল ছেলেমেয়ে উপস্থিত না থাকিবে; ঘাটে পথে তাহাদের প্রাণ বিপন্ন হইবার বিশেষ আশঙ্কা আছে। এক ছিলুম মিঠা-কড়া তামাক খাওয়াইয়া বীরু বৃদ্ধ শ্রোতাদের ভিতরে দীনু খুড়োকে উপস্থিত করাইয়াছে; একাদশীর উপবাসের জন্য নারিকেল পাড়িয়া দেওয়ায় বিন্দি পিসিকেও পাওয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধ রায়মহাশয়কেও একবার উপস্থিত করাইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। ঘোতন নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াও বাহবা লাভের আশায় এই দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিল; কিন্তু ফলটা বড়ই অপমানজনক হইয়াছে। বেলা এগারটায় রায় মহাশয় স্নানের আয়োজনে ছিলেন; ঘোতন যাইয়া কথাটা পাড়িতেই রায় মহাশয় তাহার দুই কান ধরিয়া পদদ্বয় যতদূর প্রসারিত করা যায় ততদূর প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হুকুম দিয়া, পায়খানায় চলিয়া গেলেন। তিনি দৃষ্টির বাহিরে গেলেই ঘোতন একদৌড়ে শিমুলতলা চলিয়া আসিল। অপমানের কথাটা সে আসিয়া চাপিতেই

চাহিয়াছিল ; কিন্তু রায়দের বাড়ির লক্ষ্মীছাড়ী মেয়ে দুলীটা আসিয়া সব ফাঁস করিয়া দিয়াছে।

যাহা হোক, এখন যাত্রা আরম্ভ হইবে। শিমুলগাছের ওপাশে ইতিমধ্যে এক ছোটখাটো পরামর্শ-সভায় ঠিক হইয়া গিয়াছে যে, মহিষের সহিত দুর্গার যুদ্ধের দৃশ্যটাই সর্বপ্রথমে অভিনীত হইবে ;



কারণ এই দৃশ্যটি দ্বারা প্রথমেই সকলকে তাক্ লাগাইতে না পারিলে পরে আর তাহাদের যাত্রা শুনিতে কেহই থাকিবে না। পাছে কেহ অভিনয় আরম্ভের পূর্বেই কিছু দেখিয়া ফেলে এইজন্য পাশের বাঁশবনে —চারিদিকে কয়েকখানি কাপড় টাঙাইয়া—সাজঘর তোলা হইয়াছিল।

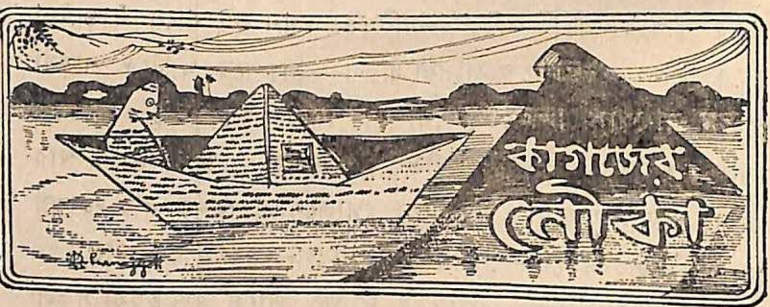
ঠিক সময় হইলে পর ভূতো ঘণ্টা বাজাইয়া দিল,—তার কাগজে মোড়া বাখারির খড়গ হস্তে দেবী আসিয়া বীরদর্পে ঘুরিতে আরম্ভ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে মহিষও ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিতে করিতে প্রবলভাবে শিং নাড়িয়া আসিয়া দেবীকে আক্রমণ করিল; দেখিয়া শ্রোতার দল তো হাসিয়া খুন,—চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। হৈ চৈ দেখিয়া দেবী এবং মহিষ উভয়েই বড় উৎসাহিত হইয়া পড়িল,—তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর দেবী তাঁহার তীক্ষ্ণ খড়গ দ্বারা মহিষকে বার বার আঘাত করিতেছেন,—কিন্তু মহিষ কিছুতেই পতনের নামটিও করিতেছে না; অধিকন্তু মহিষের ঢুঁ খাইতে খাইতে দেবী প্রায় পতনোন্মুখ হইয়া আসিয়াছেন। মহিষরূপী কেষ্টা মনে মনে ভাবিতেছিল, তাহার অভিনয় এখানেই সারা; ইহার পর পঞ্চু, ঘোতন প্রভৃতি বসিয়াই বীরদর্প করিবে আর বাহবা পাইবে, কিন্তু সে যে কাল এবং আজ—এই দুটো দিন ধরিয়া এত খাটিল, তাহা বুঝি কিছুই নয়! সে মনে মনে ঠিক করিল, এত শীঘ্র তাহার পতন সে কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না। ভাবিতে ভাবিতে সে আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল—সে পুনরায় দেবীকে সজোরে ঢুঁ মারিতে লাগিল। বেগতিক দেখিয়া পিছন হইতে আস্তে আস্তে ভূতো আসিয়া কেষ্টাকে বলিয়া দিল যে, এখন তাহার পতন হওয়া উচিত; কিন্তু কেষ্টা কাহারও কথায় কর্ণপাত করে না—দ্বিগুণ উৎসাহে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া শিং নাড়িয়া দেবীকে ঢুঁ মারিতে লাগিল।

এবারে গুঁতো খাইয়া দেবী কাৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন! দর্শকগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল;—পঞ্চু রাগে এবং ব্যাথায় গজ্ গজ্

করিতে লাগিল ঃ কিন্তু কেষ্টার উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। ঘোতন ফিস্ ফিস্ করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল,—“ওরে কেষ্টা—গাধাটা খুব হয়েছে—এখন প’ড়ে যা”; কেষ্টা কিন্তু দেবীকে মারিল আর এক গুঁতো—দেবী এক্কেবারে চিৎপাৎ! এতটা বেদনা এবং অপমান পঞ্চুর সহ্য হইল না,—সে এবারে উঠিয়াই বাখারির খড়গ দ্বারা যথাশক্তি মহিষের মাথায় প্রহার করিল,—মহিষও তখন দুই পায়ে দাঁড়াইয়া দেবীকে একেবারে মাটিতে ঠাসিয়া ধরিল—তারপরে মাটিতে পড়িয়া উভয়ের ধ্বস্তাধ্বস্তি। ভূতো, ঘোতন, বীরু, খেদু প্রভৃতি সকলে দৌড়াইয়া আসিল,—দর্শকগণ দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু কেষ্টাকে আর কিছুতেই তাড়ান যায় না! ইতিমধ্যে গোলযোগ শুনিয়া রায় মহাশয় ছুটিয়া আসিতেই সকলে—যে যেদিকে পারিল—উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়!

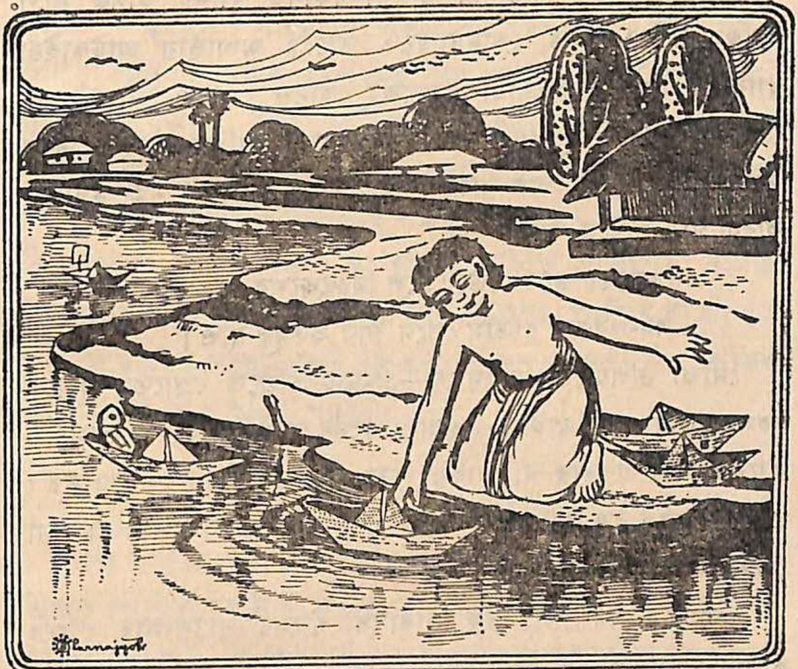
হাঁপাইতে হাঁপাইতে বোসেদের দীঘির পাড়ে জড় হইয়া সকল ছেলে ঠিক করিল, কেষ্টার সহিত আর কেহ অন্ততঃ ছয়মাসের ভিতর কথা বলিবে না।



গ্রামের পাশ দিয়া তিন ভাঁজ হইয়া বহিয়া গিয়াছে ছোট নদী—গাঁয়ের লোক আদর করিয়া নাম রাখিয়াছে কাজলী-গাঙ। কাজলী তিন চার মাইল আগাইয়া গিয়া মিশিয়াছে প্রকাণ্ড নদীর সঙ্গে—যাহার তুই তীরের গাছ-পালার তুইটি কালো রেখা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সেই নদী দিয়া দক্ষিণে আগাইতে থাকিলেই নাকি সীমাহীন সাগর—তাহার নীল জল গিয়া মিশিয়াছে দক্ষিণ দেশের কোন্ নীল আকাশের সঙ্গে।

কাজলী-গাঙের একটি ভাঁজের মোড়ে কাৎ হইয়া পড়িয়া আছে বহুদিনের একটি জাম গাছ—বিছানায় কাৎ হইয়া শুইয়া থাকা অনেক দিনের একটি পুরোনো বৃদ্ধের মত। তাহার গোটা কতক মোটামোটা

শিকড় চলিয়া গিয়াছে জলের দিকে—তাহারাই বেশ ঘাটের কাজ করে। গাছটার ডালপালা খানিকটা জলে—খানিকটা পাড়ে, স্বাস্থ্যবান্ বুড়োর মতন মরি মরি করিয়াও যেন মরিতেছে না।



নদীর পাশ দিয়াই গাঁয়ের পথ। হাঁটিতে চলিতে সব লোকেরই লক্ষ্য পড়িয়াছে আট-ন' বছরের একটি ছেলেকে। সকাল-বিকাল সে গাঙের জলে কাগজের নৌকা ভাসায়,—ছোট-বড়-মাঝারি, পাতলা কাগজের—মোটা কাগজের, সাদা-কালো, লাল-নীল কাগজের, ডিঙি নৌকা—পালতোলা নৌকা—জাহাজের মত নৌকা। কোনও

দিন তাহাতে কাগজ-কাটা মানুষ থাকে, কোনও দিন ছোট ছোট ফুল—কোনও দিন বা অতি ক্ষুদ্র এক-আধটি কাঁচা পেয়ারা। নৌকা গাঙের জলে ভাসাইয়া দিলে কোনও খানি হয়ত গঠন-দোষে একটু দূরে গিয়াই কাৎ হইয়া ডুবিয়া যাইত, কোনও খানির কাগজ জলে ভিজিয়া ডুবিয়া যাইত, কোনটা হয়ত তীরের আগাছায় আটকাইয়া থাকিত; কিন্তু একটু মোটা কাগজের কোনও কোনও নৌকা যখন স্রোতের টানে যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত ভাসিয়া যাইত, তখন উত্তেজনায় ছেলেটি গাঙ-পাড়ে একা একা পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া গান করিতে থাকিত—

স্রোতের জলে ঢেউয়ে চলে নিরুদ্দেশের নাও—
মন-পবনের বাতাস লেগে আর কতদূর যাও!

নৌকা চলিয়াছে—চলিয়াছে—চলিতে চলিতে স্রোতের ঘূর্ণিতে সহসা একটা পাক খাইয়া—হোগলা বনের পাশ ঘেঁষিয়া—জেলেদের বাঁশের ঘেরে একবার আটকাইয়া গিয়া চলিয়াছে কত দূর—কত দূর! তারপরে সেই বড় নদীতে—সেই অথৈ সমুদ্দুরে—সেই নাম-না-জানা দেশের নীলাকাশে!

ছেলেটির নাম পিলু, এই সোনামুখী গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিত কানাই চাঁদ পিপলাই-এর একমাত্র ছেলে। সোনামুখী ইহাদের আসল দেশ নয়—দেশ ছিল অনেক দূরে ঢাকা জিলায়। দাদা বলাই চাঁদের সঙ্গেই বাস করিত কানাই চাঁদ; কিন্তু দাদা বড়-চাকুরে, কানাই চাঁদ লেখাপড়াও তেমন কিছুই শিখে নাই—আয়-পত্তরও কিছুই ছিল না। বড় হইয়া বিবাহ করিয়া দুই মেয়ে এক ছেলে হইবার পর কানাই চাঁদ দেখিল—দাদার ঘাড়ের উপরে আর বেশী দিন বসিয়া থাকিলে

চলিবে না; বাহির হইল ভাগ্যের খোঁজে; বহু দূর ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই সোনামুখীতে পাইয়াছে একটা পণ্ডিতি—আর একটা ছাড়া পোড়ো বাড়ি; যাজনিক কর্মও কিছু কিছু মেলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। আজ পাঁচ ছ'বছর চলিয়া আসিয়াছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া এইখানে। তারপরে আর এখন পর্যন্ত দেশে ফেরা হয় নাই, বারবার অত দূরের পথে যাওয়া-আসারও সংগতি নাই -- ইচ্ছাও তেমন নাই। বলাই চাঁদ কিন্তু ভাইকে ভোলে নাই। দূর হইতেই বুঝিতে পারিয়াছে কানাই চাঁদের নিজের আয়ে সে খাইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না স্ত্রী-পুত্র আর মেয়ে দুইটি লইয়া—তাই দূর হইতেই দশ পারুক, বিশ পারুক প্রতি মাসেই কিছু করিয়া পাঠায়।

কিন্তু সংসারে অযাচিত মিত্রের কিছু অভাব নাই; পাড়া-পড়শীর ভিতরে কে গিয়া বলাই চাঁদের কানে লাগাইয়াছে, কানাই চাঁদ টাকা-পয়সা, জমা-জমি, লগ্নি-পত্তরে সোনামুখীতে বেশ জমাইয়া বসিয়াছে। ভীষন কান-পাতলা লোক ছিল বলাই পিপলাই; কথাটা শুনিয়া অবধি সে রাগে অভিমানে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছিল। কানাই চাঁদের বাড়-বাড়ন্ত—সে ত অতি ভাল কথা, তবে দাদার কাছ হইতে তাহা এমন করিয়া ছাপাইয়া রাখিবারই বা কি দরকার ছিল, আর তাহার কষ্টে প্রেরিত টাকাগুলিই বা এমন মাসে মাসে গায়েব করিবার কি প্রয়োজন ছিল? প্রথমে সে ভাবিল টাকা পাঠান বন্ধ করিয়া দিবে; কিন্তু তাহাতেও যে গায়ের জ্বালা যায় না, এতগুলি টাকা যে সে এতদিন ধরিয়া দিল তাহার কি হইবে? উকিলের সঙ্গে পরামর্শ

করে বলাই চাঁদ—পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, নগদ টাকা আর আদায় করিতে পারিবে না কানাই চাঁদের নিকট হইতে, তাহার চেয়ে টাকার দায়ে বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তির সব অংশ লিখাইয়া লইয়া আসিবে। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরাও শুনিয়া বলিল,—অন্ততঃ এইটুকু না করিলে যে ধর্মই থাকে না।

এইত মাত্র অগ্রহায়ণ মাস চলিয়াছে, এদেশে ইহার মধ্যেই বেশ শীত পড়িয়াছে। অজ পাড়া-গাঁ এই সোনামুখী—একেই নারিকেলবাগ আর সুপারীবাগ—বাঁশবন আর কলাবনে চারিদিক ঢাকা, তার উপর আবার কুয়াশায়-ভরা সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতে না আসিতেই ঘর-বাড়ি সব নিজ্ঝুম। কানাই পিপলাইয়ের কাল একটি শ্রাদ্ধের মন্তর পড়াইতে হইবে, তাই কুপি জ্বালিয়া সে বসিয়া তালপাতার পুঁথিখানি উল্টাইয়া উল্টাইয়া মন্ত্রগুলি একবার আওড়াইতেছিল। হঠাৎ তাহার ঝাঁপের দুয়ারে সজোরে এক সঙ্গে তিনবার আঘাত পড়িল,—'বলি কানাই আছিস্ নাকি রে?'

এ্যাঁ—এ যে দাদার গলার স্বর! কানাই পিপলাই দৌড়াইয়া গিয়া দুয়ার খুলিয়া সবিস্ময়ে বলিল,—'এ্যাঁ—দাদা তুমি যে!'

বলাই দাদা কণ্ঠ বিকৃত করিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল,—'হ্যাঁ আমি, তোর মুণ্ডপাত করতে এসেছি হতভাগা! খুব ত জমিয়ে বসেছিস্ এখানে—একটা চিঠি-পত্তর যোগ-জিজ্ঞাসাও ত করতে নেই নেমকহারাম।'

কানাই ভাবিয়া দেখিল চিঠি-পত্র সে সত্যই লেখে নাই, তাই

ভাবিল সবই দাদার অভিমান, সে কিছুই গা করিল না, আস্তে দাদার পায়ের ধূলা লইয়া তাহার হাতের ব্যাগ এবং বগলের বিছানাটুকু টানিয়া লইল। একখানি জলচৌকি টানিয়া দিয়া বলিল,—'বস দাদা, বস।'

বলাই দাদা আর বাক্য ব্যয় না করিয়া ধপাস্ করিয়া চৌকিটুকুর উপর বসিয়া পড়িল, সত্যই সে অনাহারে এবং পথশ্রমে বড় শ্রান্ত।

কানাই চাঁদের মেয়ে কলমী তখনও মায়ের সঙ্গে কাজ করিতেছিল, পুঁটি ও পিলু লেপ মুড়ি দিয়া ঘুমের আয়োজন করিতেছিল,—তাহারা যে যেখানে ছিল হুড়মুড় করিয়া আসিয়া জেঠুকে ঘিরিয়া ধরিল। মেয়েরা দু'জনে জেঠুকে প্রণাম করিল,—কিন্তু পিলু কাছে আসে না, দূর হইতে পিট্ পিট্ করিয়া জেঠুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। বলাই পিপলাই-এর চোখ পড়িল পিলুর দিকে—এত বড় হইয়াছে পিলু! কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ডাগর ডাগর চোখ, গোছা গোছা হাত-পা। বলাই পিপলাই শুষ্ক কণ্ঠেই আদর করিয়া ডাক দিল,— 'কে রে, আমার সেই পাগলা জেঠু নাকি রে?'

পিলু আরও সংকুচিত হইয়া পাশের হোগলার বেড়ার সঙ্গে মিশিয়া রহিল। বোন পুঁটি আগাইয়া গিয়া হাত ধরিতেই পিলু তাহাকে ছিটকাইয়া ফেলিল। কানাই পিপলাই ধমক দিয়া বলিল,—'ওকি হচ্ছে পিলু, জেঠুকে প্রণাম ক'রে যা।' নিতান্ত আড়মোড় ভাঙিতে ভাঙিতে আঁকা বাঁকা পা ফেলিয়া আগাইয়া আসিল পিলু জেঠুর কাছে—খানিকটা খামচির মতন করিয়া একবার পায়ের ধূলা লইয়াই দ্রুত পদে আবার ফিরিয়া গিয়া মাদুরের পিছনে মুখ লুকাইল।

বলাই পিপলাই ডাকিল,—'ওরে জেঠু, তুই কি হোগলা বনের কেঁদো বাঘ নাকি রে—একটা খাবল মেরেই যে পালিয়ে গেলি!'

কানাই চাঁদ বলিল—'তুমি দাদা জামা ছাড়, তোমার গলা পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে, আগে একটু হাত মুখ ধু'য়ে খাওয়াটা সেরে নাও—তারপরে সব কথাবার্তা হবে।'

খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বলাই পিপলাই যখন আসিয়া বিছানায় বসিয়া পান মুখে দিয়া বিড়িটি ধরাইয়াছে ততক্ষণে চাহিয়া দেখিল কানাই চাঁদের মেয়ে দুইটি এবং ছেলেটিও আসিয়া আবার তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। খাবার সময়ও তাহারা এমনিই তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল। পাতে নুন থাকা সত্ত্বেও আর একটু নুন দেয়, একখানা লেবু কাটিয়া দেয়, ডাল খাওয়া শেষ হইতে না হইতেই ঝোলের বাটিটা আগাইয়া দেয়, আঁচাইবার জন্য গরম জলের ঘটি লইয়া সাথে যায়, পায়ের চটি আগাইয়া দেয়। এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাহার মনে হইল, জেঠুকে পাইয়া এই তিনটি ছেলেমেয়ে কি যেন এক পরম ধন—এক পরম আশ্রয় পাইয়াছে। এই বিভুঁই-বিদেশে কোনও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মুখ তাহারা দেখে না,—আজ যেন তাহারা বান্ধব পাইয়াছে। জেঠুর সঙ্গে ইতিমধ্যেই পিলুর ভাব জমিয়া গিয়াছে। বলাই চাঁদ যখন বিড়িতে একটা লম্বা টান দিয়া নাক-মুখ দিয়া এক সঙ্গে অনেকখানি ধুঁয়া হুশ্ হুশ করিয়া বাহির করিয়া দিল, পিলু তখন বলিল,—'জেঠু, এখন কি তোমার পেটের মধ্যেও আগুন ধ'রে গেছে?'

'কেন রে?'

'নইলে এত ধুঁয়ো বেরোয় কি ক'রে?'

'তবে রে বোকা—! এই বিড়ির ধোঁয়াই টানের চোটে পেটের মধ্যে যায়, দেখবি?' বলিয়াই বলাই পিপলাই বিড়িতে সজোরে আর একটি দীর্ঘকালস্থায়ী টান দিল—এবং তারপরে দম আটকাইয়া খানিকক্ষণ নির্ধূম হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর মুখের এককোণ দিয়া খানিকটা ধোঁয়া বাহির করিল, তারপরে অপর কোণ দিয়া, তারপরে ঠিক মাঝখান দিয়া, তারপরে মুখ বন্ধ করিয়া ডান নাকের ছিদ্র দিয়া, পরে বাঁ নাকের ছিদ্র দিয়া—তারপরে আবার একসঙ্গে নাক-মুখ সব দিয়া হুশ্ হুশ্ করিয়া।

বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। পিলু আরও জেঠুর কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া এতক্ষণে 'রূপতরাসী' রাক্ষসের গল্পটার জন্য সানুনয় আবেদন জানাইল। কানাই পিপলাই গর্জিয়া উঠিয়া বলিল,—'তোরা কি দাদাকে আজ একটু ঘুমোতে দিবি নে? যা শীগগির ঘুমোতে যা—'

বলাই চাঁদ বলিল,—'থাক, থাক।'

কিন্তু লাঠিধারী মানুষের গলার আওয়াজ পাইলেই ভীরু খেঁক্-শিয়ালগুলি যেমন ডাক বন্ধ করিয়া লেজ গুটাইয়া বাঁশবনের গর্তে ঢুকিয়া পড়ে পুঁটিসহ পিলুও তেমনি বিছানাবনের লেপের গর্তে নীরবে ঢুকিয়া পড়িল।

এতক্ষণে বলাই পিপলাইরও মনে হইল সে শ্রান্ত, ভাত খাইয়া এখন গা ছাড়িয়া দিয়াছে। শুইবার উপক্রম করিতেই মনে হইল—বারে, যে কাজের জন্য আসা তাহার ত কিছুই হইল না। সে ঠিক করিয়া আসিয়াছিল, কানাই পিপলাই-এর কাছ হইতে সইটই যাহা লইবার এই রাত্রেই তাহা আদায় করিয়া লইবে এবং সকাল বেলা

উঠিয়াই আবার রওনা দিবে। কিন্তু এখানে আসিয়া সে ত সে সব কথা ভুলিয়া গিয়াছিল! কানাই-এর বজ্জাতি সব মনে পড়িয়া যাইতে সে উত্তেজিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল, গম্ভীর স্বরে ডাকিল, 'কানাই—'

কানাই পিপলাই আগাইয়া আসিয়া বলিল,—'ক দাদা?'

বলাই চাঁদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল,—'এখন আমার ঘুমোলে চলবে না, আমি অনেক কাজের জন্য এসেছি, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।'

'এখন ঘুমিয়ে কাল সকালে বললে হয় না দাদা?'

'নারে না – অত মিষ্টি মিষ্টি কথায় কাজ নেই। খুব ত শুনলুম এখানে জাঁকিয়ে বসেছিস্—খবর-টবর ত কিছুই আর দিস্ না।'

'কি আর খবর দেব দাদা, কোনও রকমে ত কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বেঁচে আছি।'

'কোনও রকমে বেঁচে আছি? আমি আর জানি না কিছুই? বলি এই ক'বছর ধ'রে মাসে মাসে আমার এই টাকাগুলো মারছিস্ কেন?'

কানাই চাঁদ দাদার হাবভাব দেখিয়া কেমন থতমত খাইয়া যায়, বলিল,—'দাদা, তুমি কি বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না। তোমার ও টাকা ক'টা না পেলে তোমার পিলুকে আমি বাঁচিয়ে রাখতুম কেমন ক'রে?'

এক কথায় বলাই চাঁদ কেমন ঠাণ্ডা হইয়া যায়। আমতা আমতা করিয়া বলে, 'হ্যাঁরে টাকা দেব না কেন রে? টাকা ত দেবই, তুই বললেও দেব না বললেও দেব। তা দেখ ওরা বলছিল কি—

মানে তোর টাকা ত মাসে মাসে আমি পাঠাই—আর তুই ত কোন দিন বাড়ি ঘরে যাস নে, কোনও দিন যে যাবি তাও মনে হচ্ছে না। তোর আর তা হ'লে বাড়ির ভাগ আর বিষয়-সম্পত্তির অংশ রেখে লাভ কি ?—এই ধর আমাকেই তুই সব লিখে দিলি।'

'তা কেন দেব না দাদা ? তোমার খাই-পরি—আর ঐটুকু তোমাকে লিখে দিতে পারব না ?'

'পারব না নয়, যা পারবি তা এখনই ক'রে রাখ। আমি এই কাগজ-পত্র একেবারে লিখে নিয়ে এসেছি—এইখানে সই কর।'

কানাই চাঁদ আর কথা বলিল না, কেরোসিনের কুপিটা এবং দোয়াত-কলমটা আনিয়া দাদা যেখানে যেখানে দেখাইয়া দিল সেইখানে সেইখানে সই দিয়া দিল।

পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া কানাই চাঁদ বলিল,—'দাদা, আমার ত সকালে পাঠশালা—আমি একটু বেরিয়ে যাচ্ছি, শীগ্‌গিরই আজ ফিরব। তুমি ততক্ষণে সন্ধ্যা আহ্নিক ক'রে তোমার জেঠুর সঙ্গে একটু গল্প-সল্প কর।'

দুয়ারের সামনেই বসিয়াছিল বলাই চাঁদ। হোগলার বেড়ার ফাঁক দিয়া কাল সারারাত শীত লাগিয়াছে, শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে—মনটা কেন যেন ততোধিক ম্যাজ ম্যাজ করিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে একডালা ফুল লইয়া ঘরে ঢুকিতেছিল পিলু। রাত্রে ভাল করিয়া দেখা হয় নাই, দিনের আলোতে বেশ দেখা যাইতেছে—ঠিক যেন কষ্টিপাথরের কেষ্টঠাকুরটি। কিন্তু খালি

পা, খালি গা,—একটু ময়লা ছেঁড়া ধুতি—তাহারই খোঁট কোনও রকমে জড়াইয়া লইয়াছে গায়ে। বলাই চাঁদ বলিল,—'কিরে জেঠু এত সকালে কোথায় গেছিলি?'

একগাল হাসিয়া পিলু বলিল,—'ফুল তুলতে'—

'এত শীতের মধ্যে কেন খালি পায়ে বেরোলি?'

পিলু বলিল, – 'আমার জুতো নেই'—বলিয়াই আবার কথাটা যেন ফিরাইয়া লইতে বলিল,—'আমার কখনো জুতো লাগে না, আমি খালি পায়েই বেশ বেড়াতে পারি।'

'পায়ে জুতো না দিস্—খালি গায়ে বেরিয়েছিস্ কেন শুনি?'

'বারে খালি গা কোথায়, এই যে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছি।'

'কেন জামা?'

'জামা আমি গায়ে দি না, জামা আমার ভাল লাগে না। এই কাপড়ের খোঁটও দরকার করে না আমার, দেখবে?'—বলিয়াই গা হইতে কাপড় খুলিয়া কোমরে জড়াইয়া খালি গায়ে খালি পায়ে পিলু ঘরের সামনে চক্কর মারিতে আরম্ভ করিল। বলাই চাঁদ 'থাম থাম' বলিয়া চীৎকার করিবার পূর্ব্বেই পিলু তিন পাক ঘুরিয়া ফিরিয়াছে। বলাই চাঁদ হাত ধরিয়া তাহাকে ঘরে টানিয়া তুলিতেই দেখে, বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটি দিয়া রক্ত বাহির হইতেছে। সে বলিল,— 'এই দেখ বাঁদরের কাণ্ড – পা দিয়ে যে রক্ত বেরিয়ে গেছে।'

পিলু বলিল,—'ও, হোঁচট খেয়েছি, শীতে কিছু হয় নি।'

'তোকে আর বাহাদুরি করতে হবে না জাম্বুবান কোথাকার। দেখি বউ মা একটু জল আর নেকড়া দাও দেখি নি।'

পাশ হইতে পুঁটি মন্তব্য করিল, – 'ওতে ওর কিচ্ছু হয় না।'

বলাই চাঁদ ধমক দিয়া বলিল,—'তোকে আর ফোড়ন কাটতে হবে না আহ্নি বুড়ী।'

জল আসিল, নেকড়া আসিল—বলাই চাঁদ আস্তে আস্তে পিলুর পায়ের আঙুল বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল,—'হ্যাঁরে জেঠু, কাছে কোথাও হাট-বন্দর আছে?'

পিলু মাথা দোলাইয়া বলিল,—'হ্যাঁ আছে। কেন জেঠু, কি কিনবে?'

পিলুর কচি গালটা টিপিয়া দিয়া বলাই চাঁদ বলিল,'—তোর জন্য জামা জুতো কিনবো।'

পিলু পা ছাড়াইয়া বোঁ করিয়া একটা পাক খাইয়া বলিল,—'ও সব আমার ভাল লাগে না।'

'তবে তোর কি ভাল লাগে?'

পিলু জেঠুর কানের কাছে মুখ আগাইয়া চুপি চুপি বলিল,— 'মোটা মোটা কাগজ।'

'কেন, কি হ'বে তা দিয়ে?'

'কাগজের নৌকো করব।' আরও উৎসাহিত হইয়া পিলু বলে,— 'যত মোটা কাগজ দেবে নৌকো তত ভাল হবে, তত জলে ভেসে থাকবে আর স্রোতের টানে সাঁই করে একেবারে সোজা সমুদ্দুরের দিকে চলে যাবে'—বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই পিলু হাত দিয়া সমুদ্দুরের দিকটা এবং তাহার নৌকার গতিবেগটার একটা আভাস দিয়া দিল।

বলাই চাঁদ দুয়ার হইতে উঠিল, জামার পকেটে কাল রাত্রে সই-করা দলিলের যে ক'খানা কাগজ ছিল সব আনিয়া পিলুর হাতে দিয়া বলিল,—'এই কাগজে হবে?'

চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া পিলু বলিল,—'খুউ-উব ; বারে বাঃ, এই ত চাই। এ দিয়ে নৌকো ক'রব ?'

বলাই চাঁদ মাথা নাড়িয়া বলিল,—'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

পিলুর মুখে আর কথাটি নাই। একসঙ্গে এত মোটামোটা এতগুলি কাগজ! একবার অসীম কৃতজ্ঞতাভরে জেঠুর দিকে তাকাইল, আর বার অপ্রত্যাশিত বিজয়োল্লাসে পাশের ঈর্ষাপরায়ণা পুঁটির দিকে তাকাইল, তারপরে মাথা নাড়াইয়া পা দোলাইয়া সকলের সামনে বসিয়া সেই মোটা কাগজ দিয়া পাঁচখানি নৌকা বানাইয়া লইল। তারপরে আর কোনও কথাবার্তা নাই, একেবারে সোজা দে ছুট—সেই গাঙের পাড়ে—সেই নুইয়া-পড়া জামগাছের শিকড়ের উপর। বহুক্ষণ আর তাহার টিকিটি দেখা গেল না।

কানাই চাঁদ আজ সকাল সকাল পাঠশালা ছুটি দিয়া বাড়ি ফিরিতেছিল। ফিরিবার পথে চোখ পড়িল কাজলী-গাঙের ঘাটে, পিলু যথারীতি তাহার নৌকা ভাসাইতেছে। দাদা আজ বাড়িতে—আজও তাহাকে ফেলিয়া এই সকালে নৌকা ভাসান—কানাইচাঁদের ভীষণ রাগ ধরিল। কান দুইটি ধরিয়া নীরবে বাড়ি টানিয়া লইয়া যাইবার মতলব লইয়া কানাই চাঁদ গাঙের দিকে আগাইয়া গেল। কাছে আগাইতেই একখানা ভাসমান নৌকার দিকে চোখ পড়িতেই দেখিল, – কি সর্বনাশ,—এ যে দাদার সেই দলিলের কাগজ। ঘাটে আসিয়াই কানাইচাঁদ পিছন হইতে পিলুর মাথায় ঠাস্ ঠাস্ করিয়া এমন দুই চাটি মারিল যে, পিলুর আর চিৎকার করিবার কোনও শক্তি রহিল না। আর কোনও কথা না বলিয়া গায়ের চাদর খানা পাড়ে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কানাই চাঁদ গাঙের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল

এবং সাঁতার কাটিয়া সব ক'খানি নৌকাই তুলিয়া আনিল। তারপর নৌকাগুলি খুলিয়া খুলিয়া আবার ঠিক করিবার চেষ্টা করিল,—এবং তারপর পিলুর একখানি কান ধরিয়া টানিতে টানিতে রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাড়িতে ঢুকিল।

দূর হইতেই কানাই চাঁদকে অমন করিয়া পিলুর কান ধরিয়া টানিয়া আনিতে দেখিয়া বলাই চাঁদ লাফাইয়া বাহিরে পড়িল,—বলিল,—'একি রে কানাই, একি?'

রাগে ক্ষোভে হাঁপাইতে হাঁপাইতে কানাই চাঁদ বলিল,—'হারামজাদা ছেলে সর্বনাশ করেছে দাদা। তোমার পায়ে ধরি, তুমি চ'টো না, আমি তোমার সঙ্গে শহরে গিয়েই আবার সব লিখে দিয়ে আসব।' বলিয়াই কানাই চাঁদ মহা অপরাধীর ন্যায় সেই ভিজা কাগজগুলি বলাই চাঁদের হাতে দিল।

সেগুলি দেখিয়া বলাই বলিল,—'এই কাগজ? সেই দলিলের কাগজ? সে যে আমি নিজে আমার জেঠুকে দিয়েছি।'

'কেন দাদা?'

বলাই গম্ভীর হইয়া বলিল,—'কেন? কাগজের নৌকা ক'রে স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিতে।'—বলিয়াই বলাই চাঁদ পিলুকে কানাই চাঁদের হাত হইতে ছাড়াইয়া নিজের বুকের কাছে টানিয়া লইল!



চারিদিকে ধূ ধূ ধানক্ষেত—তাহার মাঝখানে ছোট্ট গ্রাম। মাঠগুলি যখন প্রথম সবুজ ধানগাছে ভরিয়া যায়, অল্প অল্প হাওয়ায় যখন সেই সবুজ ধানের ক্ষেতে ঢেউয়ের পর ঢেউ উঠিতে থাকে, তখন মনে হয় গ্রামটি দিগন্তব্যাপী একটি সবুজ নদীর মাঝখানে ঘরবাড়ি-গাছপালায় ঢাকা একটি চর।

কিন্তু এতটুকু গ্রাম—তাহাও আবার ঠিক দুই ভাগে বিভক্ত—একদিকে বামুন-বৈদ্য-কায়েতের বাস, অন্যদিকটায় নমঃশূদ্রদের বাস। বসতির এমনতর ভাগ থাকিলেও গ্রামবাসীদের মনের মধ্যে খুব বেশি ভাগ ছিল না। কিন্তু সেই ভাগটাও সম্প্রতি এই বছর খানেক হয় বড় হইয়া দেখা দিয়াছে সামান্য একটা কারণ লইয়া।

ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল এই। তালুকদার শিবু রায়ের ছেলের বিবাহ। বিবাহে ধূম-ধাম কিভাবে করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতেছিল দুই চারি জন পাড়া-পড়শী এবং তাহাদের কুলপুরোহিত মহেশ আচার্যের সঙ্গে বাহির বাড়ির আটচালা ঘরে বসিয়া। মহেশ আচার্য একটা চৌকির উপরে বসিয়া ডাবা-হুঁকায় তুড়ুক ভুড়ুক তামুক টানিতেছিলেন। শ্রীপতি মণ্ডল নমশূদ্রদের মধ্যে মাতব্বর লোক—সেও গুটি গুটি আসিয়া আটচালা ঘরে ঢুকিয়া ছোট একটি পিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িল। শ্রীপতিকে হঠাৎ ঘরে উঠিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া মহেশ আচার্য বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকাইয়া হুঁকার জল বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। শ্রীপতি বুঝিতে পারিল, তাহারা জলচল নয় বলিয়াই মহেশ আচার্য অমন করিয়া হুঁকার জল ফেলিয়া দিয়াছেন। অপমানে লাল হইয়া শ্রীপতি নিঃশব্দে আটচালা হইতে বাহির হইয়া সোজা তাহাদের পাড়ায় চলিয়া গেল এবং তাহাদের সম্প্রদায়ের লোক ডাকিয়া কথাটা বলিল। শুনিয়া ত সকলে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। আটচালা ঘরে ত কত কুকুর-বিড়াল বসিয়া থাকে, তাহাতে উঁচু হিন্দুদের কিছু হয় না, আর তাহাদের কেউ ঢুকিলে হুঁকার জল পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়? এত ঘৃণা ভদ্দরলোকদের তাহাদের প্রতি? সেই দিন হইতে নমশূদ্ররা ঠিক করিল, ভদ্দরলোকদের সঙ্গে আর খাতিরে কাজ নাই—গ্রাম একেবারে দুই ভাগে ভাগ হইয়া গেল।

গ্রামের প্রসিদ্ধ দেবতা ছিলেন গোপালজী—অনেক পুরোনো কালের মন্দির এই গোপালজীর—আরও পুরোনো কালের মূর্তি গোপালজীর—কালোপাথরে খোদা। এখানে প্রতি বৎসর দোল

উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার গান করিবার রীতি বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে। এবারেও বহু টাকায় নন্দীগাঁয়ের কৃষ্ণ যাত্রার দল বায়না করা হইয়াছে, কিন্তু নমশূদ্ররা ঠিক করিল, তাহারা কেহই এবারে যাইবে না ভদ্রলোকদের পাড়ায় যাত্রা শুনিতে। দোলের পরদিন গোপালজীর মন্দিরের সামনে সামিয়ানা টাঙাইয়া মস্তবড় গানের আসর বসিল, যাত্রার রল আসিল, তিন পালা গান করিল—কিন্তু নমশূদ্ররা চাঁদাও দিল না, আসিলও না। কিন্তু লোভ সামলাইতে পারিল না কেবল নিবারণ ঘরামির ছেলে হরেকেষ্ট এবং তাহার চারপাঁচটি সঙ্গী। তাহারা গোরু লইয়া দুর মাঠে চরাইবার কথা বলিয়া সকাল বেলা বাহির হইয়া যাইত আর একটু দূর মাঠে গিয়া মাঠেই গোরুর গোঁজ পুঁতিয়া সেইখানে গোরু ফেলিয়া রাখিয়া লুকাইয়া গান শুনিতে যাইত,—গানের আসরের এক কোণে গিয়া ভিড়ের মধ্যে মুখ লুকাইয়া বসিয়া গান শুনিয়া আসিত। কথাটা কি করিয়া কানে গেল শ্রীপতি মণ্ডলের। সে হরেকেষ্ট এবং তাহার সঙ্গীদের একদিন সন্ধ্যাকালে ডাকাইয়া লইয়া প্রত্যেককে দুই কানে চার জোড়া কানমলা খাইবার আদেশ দিল।

কিন্তু গোষ্ঠের গান হরেকেষ্টর বড়ই ভাল লাগে। তাহার একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি হইবার পর হইতেই সে এই গোপালজীর মন্দিরের সামনে গোষ্ঠের গান শোনে—আর সেই গান সে গোটা বছরে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। গান শোনার পর দুই তিন মাস সে যেন কেমন পাগল হইয়া যায়,—সেই যে কালো রঙের কৃষ্ণটি চূড়া মাথায় নূপুর পায়ে কি সুন্দর একটি বাঁশের বাঁশী হাতে করিয়া একটু বাঁয়ে হেলিয়া আসিয়া আসরে দাঁড়ায়—আর বলরাম, ছিদাম, সুবল

প্রভৃতি রাখাল বালকরা প্রত্যেকেই হাতে পাঁচনি লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়; কৃষ্ণ মাঝখানে দাঁড়াইরা বাঁশীতে তান দেয় আর রাখাল বালকেরা হাতে পাঁচুনি তুলিয়া এবং মুখে গোরু তাড়াইবার শব্দ করিয়া নাচিতে থাকে;—আবার কখনও কৃষ্ণ মুখে বাঁশী দিয়া ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া থাকে, রাখাল বালকরা কত রকমের ফুল আনিয়া কৃষ্ণের পা হইতে আরম্ভ করিয়া মাথার চূড়া পর্যন্ত সেই ফুলে সাজাইয়া দেয়। গোষ্ঠর গানের এই সকল দৃশ্য হরেকেষ্ট কিছুতেই আর ভুলিতে পারে না। তাহার নিজের গায়ের দিকে তাকাইয়া দেখে—সেও ত ঠিক তেমনিতর কালো—তেমনিতর রাখাল—মাঠে মাঠে অপর রাখালদের লইয়া গোরু চরায়। সে সুজিতপুরের মেলা হইতে সুন্দর একটা বাঁশের বাঁশী কিনিল—নিজে নিজেই তাহাকে বাজাইতে শিখিল—তারপরে মাঠে একটু একটু করিয়া সে রীতিমত একটি কৃষ্ণযাত্রার দল গড়িয়া তুলিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে গোরু লইয়া যাহারা মাঠে যায়, তাহার মধ্যে ঢুণ্ডিবাড়ির লালু কালু চমৎকার গান করে, অন্যেরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এখন প্রায় রোজই যে-যাহার গোরু-বাছুর লইয়া হরেকেষ্টর দলে এক জায়গায় আসিয়া মিলিত হয়—গোরুগুলিকে মাঠে ছাড়িয়া দিয়া হরেকেষ্ট বাঁশীতে সুর দেয়—আর লালু কালুকে লইয়া আগে পাছে ছেলেরা গান ধরে—

আয় ভাই কানাই আয় গোঠে যাই
গগনে উঠিল ভানু।
ধেনু-বৎস সব গোঠেতে না যায়
না শুনে মোহন বেণু॥

ধূ ধূ করে মাঠ। দূরে দূরে এখানে সেখানে এক-আধটা গাছ; এক জায়গায় খানিকটা একটু উঁচু ঢিবি, তাহার উপরে বহুদিনের পুরোনো একটি তেঁতুল গাছ—গোটা দুই গাব গাছ—ছোট ছোট গোটা দুই জারুল গাছ। এই তেঁতুলতলাতেই সব রাখালছেলেদের আড্ডা। দেখিতে দেখিতে এই তেঁতুল গাছের তলাতেই একটা ছোট-খাট কৃষ্ণযাত্রার দল গড়িয়া উঠিল। নিশি মাঝির ছেলে হরিপদ একটু একটু ঢোলক বাজাইতে শিখিয়াছে, পেয়ারী কলুর ছেলে ভাসাই আবার মাথা নাড়িয়া তাহার সহিত করতাল বাজায়। আস্তে আস্তে সবাই তেঁতুলতলায় আসিয়া জুটিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেরা সকালে পান্তা খাইয়া গোরু লইয়া মাঠে বাহির হইত—দুপুরে গোরু লইয়া ফিরিত এবং এই সময়ের মধ্যেই তাহারা প্রায়দিনই একপালা যাত্রা গাহিয়া বাড়ি ফেরে। জিনিসটি ক্রমে জমিয়া উঠিতেছেও মন্দ না। হরেকেষ্ট তাহার গামছার পাগড়িতে ঘাসের ফুলের চূড়া বাঁধিলে চমৎকার দেখায়, তাহার হাতের বাঁশীটিও মানায় বেশ, লালু-কালুর গান নন্দীগাঁয়ের যাত্রা পার্টির ছোকরাদের গান অপেক্ষা কোনও অংশেই খারাপ শুনায় না হরিপদ এখন গামছা দিয়া ঢোলক কাঁধে ঝুলাইয়াই তালে তালে নাচিয়া বাজায়, আর ভাসাই করতাল বাজাইবার সময় মাথাটাকে একটু বেশি নাড়ায় বটে—কিন্তু কখনই তাল ভঙ্গ করে না।

ক্রমে কথাটা বামুন-কায়েত পাড়ার ছেলেদের কানেও গেল, গোপনে তাহারাও দু'একজন দর্শক হিসাবে উপস্থিত থাকিতে লাগিল, —তারপরে তাহাদেরও যখন মজা জমিয়া উঠিল তখন তাহারাও মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া হাতে পাঁচনি লইয়া হরেকেষ্টর যাত্রার দলে ভিড়িয়া গেল!

সেদিন কৃষ্ণকে ফুলসাজে সাজাইবার পালা। মাঠ হইতেই ছেলেরা লাল নীল বেগুনী রঙের নানারকমের ফুল যোগাইয়াছে। হরেকেষ্ট ত্রিভঙ্গ হইয়া তাহার বাঁশীটি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে—লালু-কালু দুই পাশ হইতে হাতে তালি দিয়া গান ধরিয়াছে, লালুর পাশে হরিপদ ঢোলক বাজাইতেছে, আর তিন-চারিটি ছেলে হরেকেষ্টর পায়ের কাছে নুইয়া পড়িয়া ফুল দিয়া তাহাকে নূপুর পরাইয়া দিতেছে!

বেচু বাঁড়ুজ্জে পাশের গাঁয়ে গিয়াছিলেন যজমানি কাজে; সঙ্গ লইয়াছিলেন প্রতিবেশী ললিত মুন্সী—সেই গাঁয়েই মেয়ের বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহারই একটা খবর লইতে। দুইজনেই আবার বেলা এগারটার সময় বাড়ি ফিরিতেছিলেন এই মাঠের পথ দিয়া। গাব গাছ দুইটির মাঝখানে আগাছায় ঘেরা জুলি পথ দিয়া তাঁহারা যখন এই যাত্রাদলটির দিকেই আগাইয়া আসিতেছিলেন, তখন কেহই তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। তাঁহারা প্রায় অতর্কিতে জুলি পথ দিয়া বাহির হইয়া একবার মাত্র এই যাত্রাভিনয়ের দিকে চোখ দিলেন—তারপরে একেবারে যেন ছোঁ মারিয়া হরেকেষ্টর পা দু'খানি ফুলসাজে সাজাইতে রত ছেলে-গুলির মধ্যে দুইটি ছেলেকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিলেন,—একটি বেচু বাঁড়ুজ্জের নিজের পুত্র শ্রীমান্ কার্তিক, অপরটি প্রতিবেশী ফটিক দত্তের পুত্র শ্রীমান্ বেণী। 'বলি বামুনের ছেলে হ'য়ে কার পায়ে ফুল দিচ্ছিস্' বলিয়া বেচু বাড়ুজ্জে নিজের ছেলের কান ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন; সঙ্গে ললিত মুন্সী অপর ছেলেটার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। হরেকেষ্টর যাত্রার দল

প্রথমটা ভয় পাইয়া এদিক ওদিক পলাইয়া গেল,—তারপরে আবার তেঁতুলতলায় জড় হইয়া দূর হইতে সঙ্গী দুইটির দুর্দশা দেখিতে লাগিল।

সেই দিনই রাত্রে বেচূ বাঁড়ুজ্জে শ্রীপতি মণ্ডলকে লোক-মারফতে সংবাদ পাঠাইলেন যে এইভাবে ফন্দি-ফিকির করিয়া আবার যদি কোনওদিন বামুন-কায়েতের ছেলেপিলে দিয়ে নিজের জাতের ছেলেদের পা ধরাবার ব্যবস্থা হয়, তবে জিনিসটা ভবিষ্যতে গিয়া বেশি সুবিধার দাঁড়াইবে না।

গ্রামের একপ্রান্তে যেখানে গোপালজীর মন্দির তাহার ঠিক সামনেটা জুড়িয়া অনেকখানি বড় একটা চাতাল—তারপরে একটা বড় দীঘি। গোপালজীর দীঘি বলিয়া দীঘিটিও গোপাল-দীঘি নাম ধরিয়াছে। দীঘির একপাড়ে অনেক প্রাচীনকালের একটি ঘাটলা, সিঁড়িগুলি বহু স্থানে ফাটিয়া ধসিয়া গিয়াছে। ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি দিয়া সামনের দিকে আগাইলেই হঠাৎ দীঘি বড় গভীর হইয়া অথৈ হইয়া গিয়াছে। সেই দীঘির পূব পাড় দিয়া সোজা চলিয়া গিয়াছে গ্রামের রাস্তা দক্ষিণের দিকে। সেই রাস্তা ধরিয়াই বেলা দুপুরে হরেকেষ্ট এক বোঝা তামাক মাথায় করিয়া সুজিতপুর হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। তাহার পিতা নিবারণ ঘরামি মাঠে হালুটে চাষার কাজ করে, ঘরামির কাজও করে, আবার সময় সুযোগ বুঝিয়া তামাকের ব্যবসায়ও কিছু কিছু করিত। সেই তামাক লইয়াই হাট হইতে ফিরিতে-ছিল হরেকেষ্ট। গোপালজীর মন্দিরের সামনের দীঘির পাশ দিয়া যাইতেই হরেকেষ্টর চোখ পড়িল ঘাটলার সামনের দিকে—অথৈ জলে

হাবুডুবু খাইতেছে মন্দিরের পূজারী গোলক গোসাঁই—পরনের কাপড়টা কি করিয়া খুলিয়া জড়াইয়া গিয়াছে হাতে পায়ে। হরেকেষ্ট চারিদিকে চাহিয়া কোথাও আর কোনও লোকজন দেখিল না—চীৎকার করিয়া ডাকিয়া লোক জড়ো করিবার মধ্যে পুজারী ঠাকুর জলের নীচে তলাইয়া যাইবেন। সে ঝপ্ করিয়া মাথার তামাকের আঁটি রাস্তায় ফেলিল; পরনের ছোট কাপড়খানি একটানে মালকোঁচা দিয়া পরিয়া পুকুরের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অসুরের মত বল বার বছরের হরেকেষ্টর গায়ে, সাঁতার কাটিয়া আগাইয়া গিয়া খপ্ করিয়া ধরিল গোলক গোঁসাই-এর হাতখানা; কিন্তু সাধ্য কি অত মোটা গোলক গোসাঁইকে টানিয়া কূলে আনে; তা ছাড়া হাতের কাছে মানুষের আশ্রয় পাইয়া গোলক গোসাঁই হরেকেষ্টকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছেন যে, হরেকেষ্ট জলের মধ্যে যেন আর হাতপা নাড়িতে পারিতেছে না, খাবি খাইয়া দুইজনেই তলাইয়া যাইবার উপক্রম। কিন্তু এই ভাবেই জড়াজড়ি করিতে করিতে খানিকক্ষণ পরে তাহারা পায়ের নীচে মাটি পাইয়া কোনও রকমে বাঁচিয়া গেল। গোলক গোসাঁই ইতিমধ্যে ঢোকে ঢোকে জল খাইয়া এমন ভুশ হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহার আর পাড়ে হাঁটিয়া উঠিবার সাধ্য ছিল না; হরেকেষ্টই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল।

পাড়ে বসিয়া গোলক গোসাঁই খানিকক্ষণ একটু দম ফিরাইয়া লইলেন—তাহার পর গলায় আঙ্গুল দিয়া পেটের জল অনেকখানি তুলিয়া ফেলিলেন। ইতিমধ্যে হরেকেষ্ট অন্যান্য লোক ডাকিয়া আনিলে তাহারা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে মন্দির হইতে একটু দূরে তাঁহার বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিল। গোলক গোসাঁই তখন পর্যন্ত কথা

বলিতে পারিতেছিলেন না—তথাপি হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া সকলকে বুঝাইয়া দিলেন, হরেকেষ্টর জন্যই তাঁহার প্রাণরক্ষা পাইয়াছে। সকলেই হরেকেষ্টর সাহস ও শক্তির তারিফ করিতে লাগিল, গোলক গোসাঁইও হরেকেষ্টকে কাছে ডাকিয়া গায়ে-মাথায় হাত বুলাইয়া অনেক আদর এবং আশীর্বাদ করিয়া দিলেন।

দিন পাঁচেক পরে। হরেকেষ্টর কি খেয়াল হইল একটা কলাপাতার ঠোঙা বানাইয়া তাহাতে নানারকমের ফুল সংগ্রহ করিয়া সে সকাল বেলার দিকেই চলিল গোপালজীর মন্দিরে। মন্দিরের দুয়ারে গিয়া দেখে মন্দিরের ভিতর তিন চারজন কাহারা গোপালজীর আসনে ফুল চড়াইতেছে আর গোলক গোসাঁই ছোট একটি তামার পাত্র হইতে ছোট্ট কুশী দিয়া চরণামৃত সকলের হাতে হাতে দিতেছেন। সেদিন সেইভাবে গোলক গোসাঁই-এর প্রাণরক্ষার পর এবং সকলের প্রশংসা ও আশীর্বাদের পর হরেকেষ্টর অসীম সাহস বাড়িয়া গিয়াছে—সে সোজা ফুল হাতে মন্দিরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। তাহাকে মন্দিরের মধ্যে দেখিবা মাত্র সকলেই প্রায় সমস্বরে এঁ—এঁ করিয়া উঠিল। গোলক গোসাঁই তড়িৎবেগে আগাইয়া গিয়া হরেকেষ্টর হাত হইতে ফুলগুলি ছিনাইয়া লইয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন—হরেকেষ্টকেও দিলেন বাহিরের দিকে ধাক্কা। ধাক্কা খাইয়া হরেকেষ্টও আর টু শব্দটি করিল না—মন্দিরে যেমন ঢুকিয়াছিল ঠিক তেমনই আবার বাহির হইয়া গেল।

সহজাত-বৃত্তিবশে ব্যাপারটি করিয়া ফেলিয়া গোলক গোসাঁই-এর খুব ভাল লাগিল না। পরক্ষণে তাঁহার মনের মধ্যে কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল—গোপালজীর আসনের একটি কুলুঙ্গির ভিতরে দুইটি

টাকা ছিল, তাহা লইয়া তিনি পিছনের দুয়ারটি খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন এবং দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া হরেকেষ্টর ডান হাতের মধ্যে টাকা দুইটি গুঁজিয়া দিলেন। হরেকেষ্ট টাকা দুইটির দিকে একবার তাকাইয়া টাকা দুইটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

সেখান হইতে হরেকেষ্ট সোজা বাড়ি গেল না, গেল মাঠের দিকে। জীবনের অধিকাংশ কালই কাটিয়াছে এই মাঠে মাঠে—তাই এই দিগন্তজোড়া মাঠ—এই খোলা আকাশ—এদের সঙ্গে তাহার মনের কেমন ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছে। তাই বাড়িতে কেউ একট কালা কথা বলিলে, মনে কোন কারণে ব্যথা পাইলে হরেকেষ্ট সোজা চলিয়া আসে এই মাঠে। এখানে সেখানে সে ঘুরিয়া বেড়ায়—দূরে দূরে গাছের ছায়ায় বসিয়া তাহার বাঁশের বাঁশীটি বাজায়—আবার সে খোলা মনে বাড়িতে ফিরিয়া আসে।

আজও সে মনে বড় একটা আঘাত পাইয়াছে। এই সময়ে বাঁশীটি হাতে থাকিলে বড় ভাল হইত ; কিন্তু না থাকে তো থাক—খালি হাতেই চলিল সে মাঠের দিকে—ঘুরিয়া ফিরিয়া উপস্থিত হইল গিয়া ঠিক সেই তেঁতুলতলায়। মনে তাহার বড় অপমানের ব্যথা—কিন্তু সে ব্যথা যেন রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে একটা গভীর অভিমানে। কিসের অভিমান ? কাহার উপরে অভিমান ? বুড়ো তেঁতুল গাছের চওড়া শিকড়টার উপরে বসিয়া দূরে নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে হরেকেষ্ট, জারুল গাছটার ডালপাতার আড়ালে শিস্ দিয়া একটানা সুরে ডাকিতেছে একটা নাম-না-জানা পাখী।

অভিমানে ভারী হইয়া ওঠে হরেকেষ্টর ছোট্ট মনটি। শিস দেওয়া

পাখার ডাকটি ভাল লাগিতেছে। আজ মাঠে আর তেমন লোক নাই। মাঠে এখন কোনও শস্যও দেওয়া হয় নাই—তাই গাঁয়ের গোরু-বাছুর ঘুরিয়া ঘুরিয়া আগাছার ঘাস খাইতেছে আপন মনে। আজ বারুণীর স্নান,—গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো অনেকেই গিয়াছে তিন-চার মাইল দূরে বারুণী-ঘাটের স্নানে। হরেকেষ্ট একা একা সেই তেঁতুলের চওড়া শিকড়টার উপরে তেঁতুল গাছটায় হেলান দিয়া বসিয়া রহিল অনেকক্ষণ। এখনও রোদের তাপ প্রখর হইয়া ওঠে নাই ; মাঠ হইতে আসিতেছে ঝির্ ঝির্ হাওয়া—তাহাতে মিশানো সকাল বেলার ঠাণ্ডার আমেজ ; বসিয়া থাকিতে থাকিতে হরেকেষ্টর চোখ দুইটি আপনা হইতে বুজিয়া আসিল।

একটা ধবলী গাই-এর গলায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মাঠের ভিতর দিয়া ও কে আসিতেছে ? হরেকেষ্টর দিকেই ত আসিতেছে। তাহার মাথায় এমন ফুলের চূড়া কে বাঁধিয়া দিল ? তাহার গলায় এমন মালা গাঁথিয়া কে পরাইয়া দিয়াছে ? চন্দনের বিন্দু দিয়া তাহার পাথুরে কালো মুখখানি এমন করিয়া কে সাজাইয়া দিয়াছে ? সে বাঁশীটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে হরেকেষ্টর পাশে আসিয়াই বসিল। আদর করিয়া তাহার গলাটি জড়াইয়া বলিল,—'তুমি একা এখানে এত মন খারাপ ক'রে কেন বসে আছ ?'

হরেকেষ্ট বলিল,—'তুমি কে ?'

'বারে, আমাকে তুমি চেন না ? এই মাঠে মাঠেই ত আমি ঘুরে বেড়াই—আমি যে তোমার রাখাল-বন্ধু। চেয়ে দেখত আমায় চিনতে পার কিনা।'

হরেকেষ্ট দুই চোখ তুলিয়া তাকাইয়া থাকে। এইবারে বেশ বুঝিতে পারিতেছে, কিন্তু—মুখে তাহার কথা ফোটে না।

'তোমার কি হয়েছে হরেকেষ্ট?'



'ওরা আমাকে মন্দিরে ঢুকতে দিল না।'

'তাতে দুঃখ কেন ভাই? মন্দিরে ওরা আমাকেও কোনও দিন ঢুকতে দেয় না।'

'তোমাকেও না?'

'না।'

'তবে তুমি কোথায় থাক?'

'আমি ত রাখাল—এই মাঠে মাঠেই থাকি। তোমরা যখন গোরু নিয়ে বাঁশী বাজিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াও—আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে বেড়াই। আমি কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের গোষ্ঠলীলার গান শুনে গেছি জান ?'

কিছুক্ষণ পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় হরেকেষ্টর। চোখ মেলিয়া এদিক ওদিক তাকায়—সাম্‌নে খোলা মাঠ—দূরে দূরে গোরু—আকাশের নীল রঙ—জারুলের ডাল-পাতার নীচে এখনও সেই নাম-না-জানা পাখীটি একটানা সুরে গান করিতেছে।



'চোর চোর চোর'—ভয় যেন চাপিয়া ধরিয়াছে কালুর পিসির গলাটা ; কিন্তু সেই অস্ফুট ভীত কণ্ঠেই পরিত্রাহি চিৎকার করিয়া চলিয়াছে কালুর পিসি—'চোর চোর চোর'—

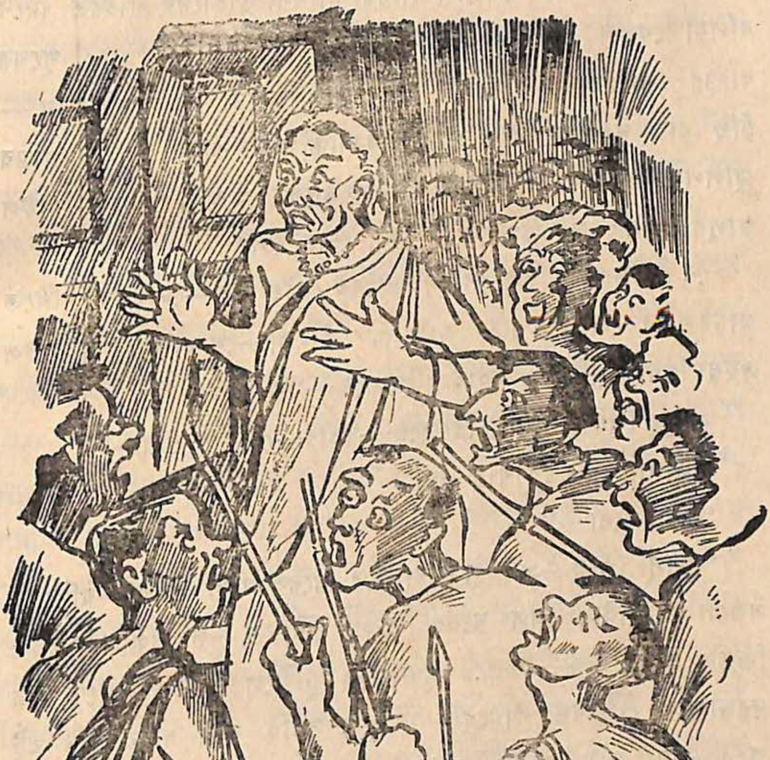
সন্ধ্যার অন্ধকার সবে মাত্র ঘনাইয়া আসিয়াছে,—ইহারই মধ্যে কোথা হইতে আসিল চোর? হইবেও বা ; কালুদের বাড়িটা গ্রামের একেবারে একপ্রান্তে, চারিদিকে শুধু বাঁশবন আর বেতবন,—মাঝখানে কাঠ আর করোগেট টিন মিশাইয়া শক্ত পোক্ত একখানি মাত্র ঘর। কালুরা বাড়ি থাকে না, কালুর বাবা শহরে কাজ করে, কালুরাও শহরেই থাকে—বছরে একবায় দু'বার

বাড়ি আসে। একা একা বাড়ি পাহারা দেয় কালুর পিসি। সবাই তাহাকে অনেক বলিয়া কহিয়াও গ্রাম হইতে শহরে লইয়া যাইতে পারে নাই।

গ্রামের লোকের কালুর পিসি সম্বন্ধে নানা রকমের ধারণা। মাত্র সাত বছর বয়সে তাহার বিবাহ হয়,—দশ বছর বয়সে সে বিধবা হয়, তাহার পর হইতে এই বাপের বাড়িতেই আছে। কেহ বলে তাহার বাপ মরিবার কালে বিধবা মেয়ে বলিয়া গোপনে তাহাকে একঘড়া মোহর দিয়া গিয়াছেন। কালুর পিসি তাহাই রাত্রির অন্ধকারে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে—বাড়ি থাকিয়া তাহারই পাহারা দেয়; কেহ বলে সে হরিভক্ত—বাড়ি বসিয়া পূজা-অর্চা-জপ-তপ করে,—কেহ বলে সে ডাইনী বুড়ী—অন্ধকার রাত দুপুরে তাহার বাড়িতে চলে আরও নানারকম সব ডাইনীদের আনা-গোনা,—কালুর পিসি বিড়্ বিড়্ করিয়া তাহাদের সঙ্গে বসিয়া কথা বলে।

এই শেষের বিশ্বাসের অনেক কারণও ছিল; বাঁশবন এবং বেতবনে বাড়িটাকে চারিদিক হইতে ঢাকিয়া রাখিয়া ভূতের বাড়িই করিয়া তুলিয়াছে। তারপরে বাড়ির ঈশান কোণে পাতা রহিয়াছে 'পঞ্চমুণ্ডী'র আসন—অর্থাৎ পাঁচজন মৃত চাঁড়ালের মাথা মাটির নিচে পুঁতিয়া তাহারই উপরে মাটির মঞ্চাকৃতি এক আসন। রোজ সন্ধ্যাবেলা এখানে শিবা-বলি হয়; অর্থাৎ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে কালুর পিসি একহাঁড়ি ভাত রাঁধিয়া কলার পাতায় এখানে রাখিয়া দিয়া একটু দূরে গিয়া হাততালি দিতে থাকে—আর তিন চারিটি খেঁকশিয়াল আশেপাশে বনবাদাড় হইতে ছুটিয়া আসিয়া সেই ভাত খাইয়া যায়।

'চোর, চোর, চোর'—চিৎকার করিয়াই চলিয়াছে কালুর পসি।



সন্ধ্যার অন্ধকারে গ্রাম ইতিমধ্যেই নিস্তব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ডাক শুনিতে পাইল আশপাশের বাড়ি হইতে সকলেই। দক্ষিণের

বাড়ির হরিহর মাঠ হইতে গোরু আনিয়া গোয়াল-ঘরের পাশের আমড়া গাছটার সঙ্গে সেগুলি বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের খাইতে দিবে বলিয়া কেবল ফেনের সঙ্গে ডালের ভুষি মিশাইতেছিল; পূবের বাড়ির তিনকড়ি দত্ত ঘাটে সিয়াই আহ্নিকটা সারিতেছিলেন,—চাঁদু রায় দূরগ্রাম হইতে হাটের বেসাতি ঘাড়ে করিয়া কেবল বাড়ির জুলিপথটার মধ্যে পা দিয়াছেন—এইভাবেই সকলে শুনিতে পাইল কালুর পিসির সেই চিৎকার—'চোর, চোর, চোর।'—

যে যে অবস্থায় ছিল সে সেইভাবেই দৌড় দিল—দেখিতে দেখিতে আটদশজন লোক লাঠি, কাটারি, কোঁৎকা—যে যাহা হাতে পাইল লইয়া গিয়া উপস্থিত—সবাই বলিতেছে—'কি—কি—কি'

কালুর পিসি শুধু চ্যাচাইতেছে—'চোর—চোর - চোর—'

'কোথায় রে—কোথায়—?'

'ঘরের মধ্যে—!'

'বলিস্ কিরে—এই সাঁজরাত্তিরে ঘরের মধ্যে চোর'—বলিয়াই সকলে আগাইয়া গেল ঘরের দিকে। তাইত,—দুয়ারগুলি সবইত ভিতর হইতে বন্ধ—ভিতরে চোর না ঢুকিলে ভিতর হইতে সব দরজাগুলি কে বন্ধ করিবে? আবার সবাই কড়া ধরিয়া খট্ খট্ করে—দুম্ দাম্ করিয়া দুয়ারে ধাক্কা দেয়—না,—দুয়ারও বন্ধ, ভিতর হইতেও কোনো সাড়া নাই। বৃদ্ধ তিনকড়ি দত্ত কালুর পিসির ডাকনাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—'বলি ওলো ফেলী, তুই বাড়িতে—এই সন্ধ্যা রাত্তিতে কি ক'রে চোর ঢুকল রে?'

কালুর পিসি এতক্ষণে ঘরের কোণে মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে,—হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোনও রকমে বলিল,—'সন্ধ্যের শিবা-বলি

দিয়ে হাত-পা ধুতে গেছি পেছনের পুকুরে, যাবার বেলা সব দুয়ার ভিতর দিয়ে বন্ধ ক'রে এই পেছনের দুয়ারটা টেনে দিয়ে বাইরে শেকল আটকে চলে গেছি, ওমা ফিরে এসে শেকল খুলে দেখি—ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে।'

ঘরে চোর ঢুকিয়াছে, কাহারও আর সন্দেহ রহিল না; সঙ্গে সঙ্গে সেই আট দশজন লোক ঘরখানি ঘিরিয়া ফেলিয়া সমস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিল 'চোর—চোর—চোর'—।

এ-শব্দ এইবারে গ্রামের সর্বত্রই গিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে 'আসছি আসছি,' 'ভয় নাই ভয় নাই,' 'ধর ধর, মার মার' শব্দে সাড়া জাগিয়া উঠিল। আর পনের বিশ মিনিটের মধ্যে দেখা গেল মশাল জ্বালাইয়া, লণ্ঠন ধরাইয়া কলা-নারিকেলের পাতা জ্বালাইয়া শুধু লোক আসিতেছেই—হাতে লাঠি, কাটারি, লেজা, সড়কি—গ্রাম্য অস্ত্র-শস্ত্র হাতের কাছে যাহা পাওয়া যায়। যত লোক আসিতেছে, তত চিৎকার বাড়িতেছে, যত চিৎকার বাড়িতেছে তত লোক বাড়িতেছে। বিশ-পঁচিশ মিনিট পরে দেখা গেল, মাথায় মাথায় কানুদের বাড়ির উঠোন, পেছন, আনাচ-কানাচ সব ভরিয়া গিয়াছে। কোলাহলে কোলাহলে এখন শুধু একটা তুমুল হৈ চৈ-ই হইতেছে,—আর আস্ফালনই চলিতেছে। কি ব্যাপার, কি বৃত্তান্ত কেহ কিছু জানে না, জানিবার উপায়ও নাই।

দেখিতে দেখিতে দেখা গেল, বাড়ির সামনের দিকটার পথে প্রায় সূর্যের মতন একটা প্রখর আলো জ্বলিয়া নিভিয়া আগাইয়া আসিতেছে, আলোর ছটায় সব বাড়িটা একবার একসঙ্গে আলোকিত হইয়া আবার অন্ধকার হইয়া যাইতেছে। সকলেরই বিস্ময়দৃষ্টি

পড়িল সেই আলোর দিকে—বিস্ময়ে সকলে একেবারে ধাঁ করিয়া থামিয়া গেল ; উমেশ আইচ বলিয়া উঠিল,—'ওরে শ্যামবাবুদের টর্স্ টর্স্ টর্স্ ; শ্যামবাবুদের ছেলে এসেছেন ক'লকাতা থেকে, তিনি নিয়ে এসেছেন।' বিস্ময়ের মাত্রা লাঘব হইবার সঙ্গে সঙ্গে আবার দ্বিগুণ জোরে চিৎকার উঠিল,—'চোর, চোর—চোর !'

টর্চ্ বাতি লইয়া চশমা চোখে শ্যামবাবুর শহুরে ছেলে আসিল, তাহার সঙ্গে শ্যামবাবু নিজে—গ্রামের বর্দ্ধিষ্টু মাতব্বর। তাঁহাকে দেখিয়া দ্বিগুণিত চিৎকার সহসা ত্রিগুণিত হইয়া উঠিল—'চোর চোর চোর—!'

শ্যামবাবু হুংকার রবে ধমক দিলেন—'থাম্—থাম্—থাম্।'

শ্যামবাবুর ধমক খাইয়া সবাই আবার থামিয়া গেল। শ্যামবাবু রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—'চোর তা চ্যাঁচালে কি হবে ? একটা বিহিত ব্যবস্থা-ত করতে হবে ? কি ব্যাপারটা হয়েছে শুনি।'

শ্যামবাবুর কথা শুনিয়া ভিড় ঠেলিয়া বৃদ্ধ তিনকড়ি দত্ত আগাইয়া আসিয়া ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া শ্যামবাবু নিজে আবার গম্ভীরভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দুয়ারগুলি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, তাহার ছেলে লম্বা ডাঁটওয়ালা টর্চ বাতিটা জ্বালাইয়া জ্বালাইয়া পিতার সঙ্গে ততোধিক গম্ভীরভাবে ঘুরিতে লাগিল। গোটা ঘরখানি একবার ঘুরিয়া আসিয়া শ্যামবাবু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, চোর ছাড়া আর কি হবে ?' বলামাত্র আবার একটি উৎকট ধ্বনির হিল্লোল সমগ্র গ্রামের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিয়া উঠিল—'চোর—চোর—চোর—'যত বেশি চিৎকারের আলোড়ন, তত বেশি লোকসমাগম।

লোক এখন আসিতেছেই—গ্রাম ছাড়িয়া আশপাশের গ্রামের লোকও বোধ হয় ছুটিয়াছে ছুইচারি জন।

ইহার মধ্যেই আবার ঘরের এককোণ হইতে একদল লোক বলিয়া উঠিল—'ঐ ঐ ঐ—ঐ যে একটার পা দেখা যায়'—বলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পা লক্ষ্য করিয়া চার পাঁচটি সড়কি বল্লম চৌকাঠের নীচ দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে যেন ভিতর হইতে একটা আর্তনাদের মতনও শোনা গেল—কাহার আর্তনাদ, কি আনর্তাদ—এত চিৎকার হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে কিছুই বোঝা গেল না। উত্তেজনার আতিশয্যে তিন-চারিজনে তাহাদের হাতের সড়কি ভিতরে ছাড়িয়াই দিয়াছে, একজন মাত্র আঘাত করিয়া আবার বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে। যে সড়কি বাহিরে টানিয়া আনিল সে মশালের আগুনে দেখিল, তাহার সড়কির আগায় লাল টকটকে তাজা রক্ত। এই তাজা রক্তের দর্শনে পৈশাচিক উল্লাসে সবাই পাগল হইয়া মাতিয়া উঠিল। খুন দেখিয়া সকলের মাথায়ই খুন চাপিয়া গেল।

কিন্তু এত হৈ চৈ ভাল লাগিতেছে না একটু বয়স্কদের, তাঁহারা চটিয়া-মটিয়া বলিতেছেন,—'ওরে থাম—থাম—থাম—।' কিন্তু কে থামায় কাহাকে? কে শোনে কাহার কথা? কেহ কোঁৎকা ঘুরাইয়া তিন পাক খাইয়া বলিতেছে, চোরের বা চোরগণের ব্রহ্মরন্ধ্র সে একাই ফাটাইয়া দিবে,—যাহার হাতে সড়কি যে বলিতেছে সড়কি দিয়া সবগুলিকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করিয়া তবে সে স্থান পরিত্যাগ করিবে,—যে কাটারি হস্তে ঘুরিতেছে, সে বলিতেছে কচ্ছপের মতন চিৎ করিয়া ফেলিয়া সব টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে।

ডামাডোলের মধ্যে শ্যামবাবু আবার ক্ষেপিয়া গিয়া হুংকার দিলেন, এইবারে আবার সব চুপ ! তিনি বলিলেন,—'যত গোবেটের দল, চেঁচিয়ে-মেচিয়ে—লাফালাফি ক'রে কি কখনও চোর ধরা যায় ? তারা একজন না পাঁচজন—তারা খালি হাতে না অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসেছে—কেউ কিছু খবর জানিস্ ? ঢুকবি কি বেল্লিকগুলো, হাতের সড়কিগুলো পর্যন্ত ঘরের ভিতরে ছুঁড়ে দিলি,—এখন যে তোদের সড়কি দিয়েই তোদের ছেঁদা করবে তা ঠেকাবি কি করে ?'

শ্যামবাবুর ধমক এবং গালিগালাজ খাইয়া সকলে শুধু চুপ করিল না, সকলেরই চৈতন্যোদয় হইল। যাহারা উত্তেজনার আতিশয্যে সড়কিগুলি ঘরের মধ্যে ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল তাহারা এখন বেশ পস্তাইতে আরম্ভ করিল। সত্যইত ঘরে এখন ঢোকা যাইবে কেমন করিয়া—আর হাতে প্রাণ করিয়া কে-ই বা ঢুকিবে ? কেহ কেহ প্রস্তাব করিল, মাটির ভিতে সিঁদ খুঁড়িয়া ঢোকা যাক ! অপরে জিজ্ঞাসা করিল, সেই সিঁদের ভিতরে প্রথমে মাথা ঢুকাইবে তো ?—লোহা দিয়া বাঁধানো কাহার কাহার মাথা ? কোঁৎকা ঘুরাইয়া, সড়কি উঁচাইয়া, কাটারি দেখাইয়া যাহারা এতক্ষণ তাণ্ডব নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছিল, তাহারাও সহসা একটু ভড়কাইয়া গেল, কেহই তেমন আর উচ্চবাচ্য করিল না।

এই নীরবতার সুযোগ লইয়া শ্যামবাবু সহসা আগাইয়া গেলেন প্রধান দুয়ারটার কাছে, সেখানে গিয়া তিনি তাঁহার জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'আরে ভিতরে যে বা যারা আছিস্ শোন, অভাবের তাড়নায় লোক আর মতিভ্রমেই হোক, যা ক'রে ফেলেছিস,—ত করেছিস্,— এখন দুয়ার খুলে বেরিয়ে পড় ; এখন বেরোলে প্রাণে মারব না,

কথা দিচ্ছি; আর তা না হলে একবার ঘরের বেড়া ভেঙেই যদি ভিতরে ঢুকে পড়ি, তবে তোদের কাউকে আর জ্যান্ত রাখব না; ঐ পুলিস-ফুলিসের ধার ধারি না আমরা, মেরে এই রাতারাতি দশহাত মাটির নীচে একদম পুঁতে ফেলব। এখনও বলছি বের হ'— বলিয়া তিনি যেন ভিতর হইতে দুয়ারগুলি খুলিয়া যাইবার আশায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু অনেকক্ষণের মধ্যেও ভিতর হইতে কোনওরূপ কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এবারে শ্যামবাবুও আস্ত ক্ষেপিয়া গেলেন,—তিনি তাঁহার নিজের হাতের মোটা লাঠিটির দ্বারা দরজায় সজোরে আঘাত করিয়া বলিলেন,—'একসঙ্গে ভেঙে ফেল সব দুয়ার—ভাঙ সব বেড়া, তারপরে ঢুকে পড় দেখি একসঙ্গে সব ঘরের মধ্যে।'

শ্যামবাবুর এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে শক্তকাঠের দুয়ারগুলি ও করোগেট টিনের বেড়াগুলির উপরে পড়িতে লাগিল দমাদম কুড়ুলের ঘা—কাহারা হাতিয়ার করিয়া লইয়া আসিয়াছিল এতগুলি কুড়ুল—কেহ তাহা জানে না। দমাদম পিটুনির সঙ্গে সঙ্গে কাঠের পাটাতনের উপরে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইয়া অনেকগুলি মাটির হাঁড়িকুঁড়ি নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই— 'ঐ, ঐ'—করিয়া আবার চেঁচাইয়া উঠিল। কেহ বলিল—'ঐ যে সিঁড়ি বেয়ে মাচায় উঠছে,'—কেহ চিৎকার করিয়া উঠিল, 'ওরে ঐ যে কাঠের ফাঁকে দেখা যাচ্ছে—একটা নয়, তিন চারটে—ঐ যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে,'—অপর একজনে—'ঐ যে সড়কি তুলে ধরেছে— মারল ছুঁড়ে' বলিয়াই মরি বাঁচি করিয়া দৌড় মারিল—তাহার

পিছনে গণ্ডা-দশেক লোক দৌড় দিয়া পিছনের আগাছার বাদাড়ে হুমড়ি খাইয়া পড়িল।

কিন্তু গোঁয়ার দন্তা গোসাঁই ইতিমধ্যেই পিছনের কাঠের দরজা ভাঙিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে—তাহার চারিদিকে লেজা সড়কি উঁচাইয়া ঢুকিয়া পড়িল পাঁচসাতজন লোক। সাহস পাইয়া সামনের দিকের লোকেরাও সামনের দুয়োর ভাঙ্গিয়া সোজা ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু কি আশ্চর্য—ঘরে ত একজন লোকও নাই! অথচ ঘরের মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা কাঁচা রক্তের দাগ রহিয়াছে! তবে কি হইল? মশাল লইয়া সকলেই ঘরের এদিক-সেদিক খোঁজ করিতে লাগিল, শ্যামবাবুর ছেলেও এতক্ষণে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া তাহার টর্চ্ বাতি ফেলিয়া দেখিল, কোথাও কিছু নাই! কাঠের সিঁড়ির উপরে রক্তের দাগ দেখা দিল,—কাহারও বুঝিতে অসুবিধা হইল না, ভয়ে সব কাঠের পাটাতনের উপর উঠিয়া গিয়াছে।

আবার সেই সমস্যা! সিঁড়ি দিয়া পাটাতনের ভিতরে কে আগে মাথা গলাইবে! এবারে কিন্তু সমস্যা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না—দন্তা গোসাঁই এবারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে; ঘোষদের পাঁঠা-কাটা পাতলা ঝকঝকে খড়গখানি হাতে লইয়া ঠিক মহিষাসুর মূর্তিতে কাঠের সিঁড়িটার উপরে লাফাইয়া উঠিল দন্তা গোঁসাই—সঙ্গে সঙ্গে তাহার দু'পাশ দিয়া দুইটি দুইটি চারিটি সড়কি উঁচাইয়া ধরিল আর চার-জনে; পিছন হইতে টর্চের আলো ধরিল শ্যামবাবুর ছেলে। একটা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিয়া পড়িল দন্তা গোসাঁই পাটাতনে—সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়া উঠিল পড়িল আর চার পাঁচ জন—বাহিরে ঘরখানিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে অন্ততঃ তিন চারিশত লোক—যাহার হাতে

যাহা ছিল তাহাই উঁচাইয়া ধরিয়া। কিন্তু কই—পাটাতনের উপরেও ত দেখা যাইতেছে না কাহাকেও—! এতক্ষণে পাটাতন ভরিয়া গিয়াছে দশ বার জন লোকে—কাঠের সিঁড়িতে পর পর দাঁড়াইয়া আছে আর আট দশ জন—নীচে ঘরের মধ্যে চল্লিশ পঞ্চাশ জন। সহসা মড়্ মড়্ শব্দে পাটাতনের এক অংশ ভাঙিয়া কাঠের সিঁড়িসুদ্ধ উপরের সাত আট জন লোক বিপুল শব্দে নীচে পড়িয়া গেল লোকজনের মাথা ঘাড়ের উপর, আর এক সঙ্গে 'বাবাগো মাগো—গেলুমরে মলুমরে' শব্দে সমস্ত ঘরটা ভরিয়া উঠিল। ব্যাপারটা কি সহসা কেহই স্থির করিতে পারিল না। ঘরের বাহিরে যাহারা ছিল তাহারা মনে করিল, নিশ্চয়ই পাটাতনের উপরে চোরদের অনেক লোক—তাহারা নীচে ঘায়েল করিয়া ফেলিয়াছে বহু লোককে। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি বশতঃ দৌড় দিয়া যে যাহার ঘাড়ে মাথায় পড়িল—কোনোটা কাছের ডোবা-খানায় পড়িয়া গেল, ঘরের লোক লাফাইয়া বাহিরে পড়িতে লাগিল, আবার সাহসী যাহারা তাহারা বাহির হইতে লাঠি-সোটা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ঘরের ভিতরে দৌড়াইয়া ঢুকিল—চারিদিকে আবার সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ লণ্ড ভণ্ড কাণ্ড! ঘরে যাহারা ঢুকিল তাহারা ভাঙা পাটাতনের নীচ হইতে টানিয়া টানিয়া লোকজন বাহির করিতে লাগিল, কাহারও মাথা ফাটিয়া দরদর রক্ত পড়িতেছে, কাহারও হাত ভাঙিয়া গিয়াছে, —কাহারও পিঠ বাঁকা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কেহই মরে নাই—কাহারও আঘাত তেমন মারাত্মকও নহে, অন্ততঃ কাহারও আঘাত যে বেশি এক বৃদ্ধ তিনকড়ি দত্ত ব্যতীত সে-কথা আর কেহই স্বীকার করিল না।

খানিকক্ষণ হট্টগোলের পরে বোঝা গেল, ব্যাপারটা আর কিছুই নহে—পুরাতন পাটাতন অতবড় খুমসো ধুমসো পালোয়ানদের ভার সহ্য করিতে পারে নাই—চোরদের কোনও রূপ হস্তক্ষেপ ব্যতীত আপনা-আপনিই ভাঙিয়াছে। তাড়াতাড়ির মতন আহতদের কিছু কিছু সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিয়া আবার সকলের মন গেল চোরের দিকে।

দন্তা গোসাঁইএর কোমরে দারুণ ব্যথা লাগিয়াছে, কোমর টান করিতে এখনও বেশ লাগিতেছে—ভুরু কুঁচকাইয়া দন্তা গোসাঁই বলিল,—'আমি পারব না রে জগা,—দেখ দেখি তোরা পাটাতনে উঠেকিছু দেখিস্ নাকি।'

এবারে আর হুড়মুড় করিয়া নয়, আস্তে-সুস্থে দু'চার জন আবার বাঁশ বাঁধিয়া মই করিয়া উপরে উঠিয়া গেল—তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, এখানে সেখানে রক্তের দাগ দেখিল, কিন্তু মানুষ দেখিল না কোথাও। সে দল নামিয়া আসিলে আর একদল উঠিল, তাহারা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে আরও একদল গিয়া উপরে উঠিল,—তাহারাও আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়া বলিল, 'হ্যাঁ, উপরেও রক্তের দাগ আছে,—কোনও মানুষ নাই!'

তাইত! ব্যাপারটা কি হইল! সবাই কেমন একটা ধাঁধাঁয় পড়িয়া গেল। ভিতর হইতে ঘর বন্ধ—তারপরে এত পায়ের শব্দ—মানুষ দেখা—হুড়ঝুড় করিয়া হাঁড়ি পাতিলের নিম্নে-পতন এবং ভাঙিয়া টুকরো টুকরো হওয়া—সর্বোপরি উপরে নিচে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত—অথচ কোথাও কোনও জনপ্রাণী নাই—ব্যাপারটা তাহা হইলে কি হইতে পারে। এত লোক—এত মশাল—ইহার ভিতর দিয়া চোর

পালাইবেই বা কি করিয়া? এখন হাঁকডাক থামিয়া গিয়াছে— চারিদিকে আস্তে আস্তে দেখা দিল কেমন একটা থম্‌থম্‌ ভাব। এ উহার কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করে, সে আবার রহস্যজনকভাবে মাথা নাড়ে। তারিণীচরণ বৈরাগীকে দেখা গেল সে ইতিমধ্যেই ঘরখানির চারিপাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িয়া ধূলা-পড়া ছড়াইতেছে; দু'এক জন ব্রাহ্মণ ঠাকুর ইতিমধ্যেই পৈতাটা হাতে জড়াইয়া গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু ঘরামি ইতিমধ্যে মৃদু মৃদু রামনাম উচ্চারণ করিতেছে। মুরুব্বি শ্যামবাবু ঘরের বাইরে আসিয়া কালুর পিসিকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন; কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন,—হ্যাঁরে, অন্ধকারে দেখেটেকেছিস্‌ কিছু?' শুনিয়াই কালুর পিসি কেমন কাঁপিতে আরম্ভ করিল,— কাঁপিতে কাঁপিতেই বলিল,—'যা দেখেছি বাবু গো, তা আমি মুখে বলতে পারব না।'

হরু ভটচায বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আরে এত লোকের মধ্যে ভয় কি? তুই বলই না দেখি।'

শুধু কণ্ঠস্বর নয়--সব দেহই কাঁপাইতে কাঁপাইতে কালুর পিসি বলিল,—'মনুষ্য নয় বাবা, মনুষ্য নয়—কালো কালো—যেন চারি হাতপায় হাঁটে—আগুনের মত জ্বলন্ত চোখ—বাবা আমি বলতে পারব না— বলিয়াই কালুর পিসি ভিরমি দিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

এতক্ষণে অনেকেরই গায়ে ঈষৎ ঘাম-ঘাম ভাব এবং মৃদু কম্পন দেখা দিয়াছে। যাহাদের হাতে মশাল ছিল তাহারা মশাল আরও জোরে জ্বালাইয়া দিল, লণ্ঠনওয়ালা টিপিয়া লণ্ঠনের তেজ বাড়াইয়া লইল,—শ্যামবাবুর ছেলে টর্চের আলোটা কেবল এদিক সেদিক

ফেলিতে লাগিল, শ্যামবাবু হরু ভটচাযকে লক্ষ্য করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—'ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারলে হরু ভায়া?'

হরু ভটচায ততোধিক গাম্ভীর্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—'বুঝতে আর বাকি নেই কিছু হরু ভটচাযের, এ জীবনে সে অনেক দেখেছে।'

শ্যামবাবু বলিলেন,—'তা হ'লে এখন উপায়?'

হরু ভটচায জবাব দিলেন,–'উপায় আপাততঃ আজ সারারাত আগুন জ্বেলে' সরষে পোড়ান; তারপরে কাল দিনের বেলায় ওঝা-পণ্ডিত ডেকে বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করা।'

শ্যামবাবু বলিলেন,—'আঘাত ত একবার একটা করা হয়েছে।'

হরু ভটচায বলিলেন,—আপনি ক্ষেপেছেন। ওদের গায়ে কেউ 'কনও করতে পারে আঘাত?'

'তবে ও রক্ত কিসের?'

'ওরা ত ইচ্ছে করলেই রক্তবৃষ্টিও করতে পারে।,

এই সব কথা হইতেছে, এমন সময় পাটাতনের উপর হইতে কেমন যেন একটা আর্ত শব্দ শোনা গেলে—সকলেই একসঙ্গে কানখাড়া করিল—আবার—আবার; এইবারে আর বুঝিতে কষ্ট হইল না, একটি বিড়ালের 'ম্যাও ম্যাও' ধ্বনি—কিন্তু এত গম্ভীর কেন? বিড়াল ত বটে?

কয়েকজন লোক আস্তে আবার গিয়া কাঠের পাটাতনে উঠিয়া পড়িল–খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল, সত্যই ত একটা হাঁড়ির মধ্যে একটা বিড়াল—পিছনের বাঁ পাটা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে—একটা সড়কির আঘাতের দাগ ঘরময় তবে কি এই বিড়ালটারই রক্ত?

বিড়ালটার কাছে আর একটু আগাইতেই বিড়ালটা প্রাণভয়ে হুড়মুড় করিয়া ঐ আহত পা'টা লইয়াই একটা লাফ দিল—সেই

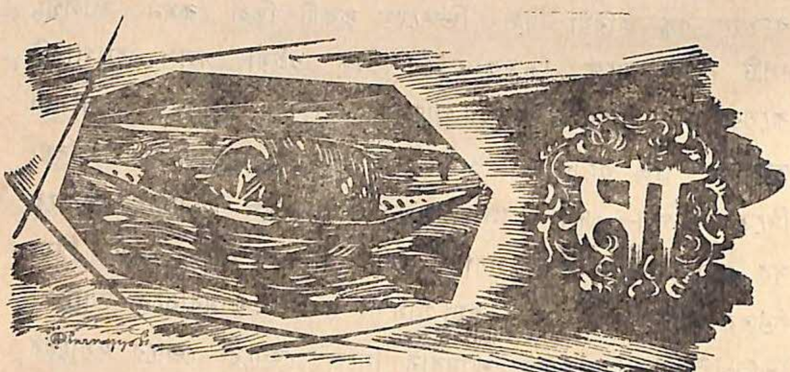
লাফের ধাক্কায় আর দু'একটা মাটির হাঁড়ি আবার নীচে গড়াইয়া পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। তবে কি এই বিড়ালেরই সব কীর্তি!

লোকগুলি নীচে নামিয়া আসিল। সবাই এখন ব্যাপারটা একটু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় একটা দমকা হাওয়া আসিল দক্ষিণ হইতে, যে-দুয়ারে শিকল টানিয়া দিয়া কালুর পিসি ঘাটে গিয়াছিল সেই দুয়ারটার দুটি পাটই সজোরে বাতাস বন্ধ করিয়া দিল-- ভিতরের হুকটি ছিল কেমন আলগা, সেটি সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে বন্ধ হইয়া গেল। ব্যাপারটি কয়েকজন লোকের চোখে পড়িতে তাহারা আগাইয়া আসিয়া দুয়ারের পাট দুইটা বাহির হইতে জোরে টানিয়া বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল—দেখা গেল তিন চারিবার এরূপ করিলেই যেবারে খুব জোরে টানা হয় সেবারে হুকটা ভিতর হইতে পড়িয়া গিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ হইয়া যায়। তখনই শ্যামবাবুকে ডাকিয়া জিনিসটি দেখান হইল, শ্যামবাবু নিজে জোরে জোরে দুয়ারের পাট টানিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিতেই দুই তিনবার হুকটি ভিতর হইতে আটকাইয়া গিয়া দুয়ার ভিতর হইতে বন্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। শ্যামবাবুর পাশেই ছিলেন হরু ভটচায,— বলিলেন,—'ভায়া বুঝলে ব্যাপারটা?'

এবারে হরু ভটচায কথা বলিল না-- কথা বলিল রগচটা নগেন পালিত—তিনি বলিলেন,—'বুঝব না কেন ব্যাপারটা।'

'চোর না ভূত?'

'চোরও নয়, ভূতও নয়—আমাদের সকলের মাথা—মাথা—মাথা!'



লোকে নাম রাখিয়াছে আগুনমুখা নদী।

কেন এই নাম বুঝিতে বেশি কষ্ট হয় না। দু'চার দিন একটু এই নদীকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই ইহার অদ্ভুত প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়। এই কেমন শান্ত সুস্থ—ঢেউটি নাই—সাড়াটি নাই, দু'দিকে দিগন্তবিস্তৃত শ্যামল মাঠ—মাঝখানে যেন ঝিমাইতে ঝিমাইতে বহিয়া চলিয়াছে নদী; কখন্ আবার পূবে একটু হাওয়া দিল—অমনি সে যেন চটিয়া-মটিয়া অগ্নিশখা—ফুঁসিয়া গর্জিয়া পাগল হইয়া উঠিয়াছে, পালতোলা নৌকাগুলিকে শিশুর হাতের খেলনার মতন দোলাইতেছে নাচাইতেছে—ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া

চড়্ চড়্ করিয়া উঁচু পাড়ের মাটি ভাঙিয়া ফেলিতেছে, বড় বড় গাছগুলিকে শিকড়সুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতেছে।

কিন্তু তথাপি এখানে নৌকার বড় ভিড়, কারণ নৌকা ছাড়া এপারে-ওপারে যাতায়াতের আর কোনও উপায় নাই।

সকাল হইতে পূবাল হাওয়ায় একখানি দু'খানি করিয়া পাতলা মেঘ ভাসিয়া যাইতেছিল; দুপুরের পর হইতে দেখা গেল, একটু একটু করিয়া পশ্চিমের মেঘ ক্রমেই কালো হইয়া জমিয়া উঠিতেছে। গতিক তেমন ভাল না দেখিয়া মাঝিমাল্লারা তাহাদের নৌকাগুলি নদীর ঘাট হইতে আস্তে আস্তে তুলিয়া আনিয়া পাশের ছোট একটা সোতাখালের ভিতরে ঢুকাইয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে; কাছেই ছিল জমিদারের কাছারী-বাড়ি এবং তাহার সংলগ্ন দুই একখানা দোকানঘর; এই ঘরগুলির আশে-পাশেই জমিয়া উঠিয়াছে মাঝি-মাল্লাদের ভিড়।

দণ্ড চারেক বেলা থাকিতে মেঘের ভিড়ও বাড়িয়া গেল, বাতাসও সহসা স্তব্ধ হইয়া গেল, আতঙ্কে মাঝি-মাল্লাদের মুখের শব্দও থামিয়া গেল।

এমন সময় দেখা গেল, বছর তিরিশেক বয়সের একটি যুবক আসিয়া সেখানে উপস্থিত;—দেখিলেই মনে হয় বেশ ভদ্র ঘরের ছেলে। খুব জোরে হাঁটিয়া আসিয়াছে, ঘামে গায়ের গেঞ্জি ভিজিয়া পাতলা পাঞ্জাবীও ভিজিয়া উঠিয়াছে। যুবকটি আসিয়াই মাঝিদের কাছে আগাইয়া বলিল,—'আমাকে কেউ একটু নদীটা পার ক'রে দেবে?' কথা শুনিয়াই মাঝিরা এ উহার মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল,—লোকটা পাগল নাকি!

একটি বৃদ্ধ মাঝি বলিল,—'জোরে জোরে হেঁটে এসেছ কত্তা, একটু জিরিয়ে নিয়ে কথা কও।'

অপরে টিপ্পনী কাটিল,—'একটু আশপাশের দিকে তাকিয়ে কথা কও বাবু।'

যুবকটি অসহায়ভাবে বলিল—, 'আমার যে আজ না গেলেই নয়।'

'গরজেই কি নৌকা চলে?'—বলিয়া উঠিল কেহ মাঝিদের ভিতর হইতেই। একটি প্রৌঢ় মাঝি কিঞ্চিৎ সহানুভূতির সঙ্গে বলিল,—'তোমার ঠেকা আছে বাবু তা তোমার হন্তদন্ত চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি; কিন্তু এখন নৌকায় উঠলে তুমিও মাঝ দরিয়ায় প্রাণ হারাবে, টাকার লোভে যে তোমাকে নায়ে তুলবে সেও প্রাণ হারাবে। তাতে কি আর ঠেকার কোনও সুরাহা হবে?'

যুবকটিও সবই বুঝিতেছে, আকাশের অবস্থাও দেখিতেছে, বাতাসের অবস্থাও দেখতেছে—আগুনমুখা নদীর খবর সবই জানে। কিন্তু বুঝিয়াও সে বোঝে না, আকুল আগ্রহে সে যেন পাগল হইয়া উঠিয়াছে, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে সকল মাঝি মাল্লাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর প্রত্যুত্তরে যে জবাব পাইতেছে তাহাতে সহানুভূতির স্নিগ্ধতাও আছে, বিদ্রূপের ঝাঁজও কম নয়। বিফলমনোরথ হইয়া খানিকক্ষণ যুবকটি জমিদারের কাছারী-ঘরের বারান্দায় ভাঙা বেঞ্চিতে বসিয়া রহিল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যেন ছট্‌ফট্‌ ছট্‌ছট্‌ করিতেছে। কিছুকাল পরে সে আবার উঠিয়া আসিল, মাঝিদের কাছে গিয়া করুণ সুরে বলিল,—'দেখ, আমার মায়ের বড় অসুখ,—আমি আমার মায়ের একমাত্র ছেলে।'

একটি মাঝি চটিয়া গিয়া বিরক্তির সুরে বলিল,—'আরে এ ত' আচ্ছা মন্দ নিয়ে পড়া গেল! বলি তুমি নদীর জলে চুবুনি খেয়ে খেয়ে পরের দিন হোগল বনের কোলে গিয়ে ঢোল হয়ে ভেসে উঠলে কি তোমার বুড়ী মা বেঁচে উঠবে?'

ধকম খাইয়া যুবকটি আবার আসিয়া আঘাত পাওয়া কেঁচোর মতন সেই ভাঙা বেঞ্চিটিতে কুঁচকাইয়া বসিল।

কিন্তু সকলেরই দৃষ্টি পড়িল আর একটি যুবক মাঝির দিকে—সে কোনও কথা না বলিয়া নদীর পাড় ধরিয়া সোতাখালের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল, সে সোতাখাল হইতে তাহার নৌকা বাহির করিয়া নদীর কূল ধরিয়া বাহিয়া আসিতেছে। কাছারী-ঘরের সামনে আসিয়া সে নৌকা হইতে পাড়ে উঠিল, ভদ্র যুবকটির কাছে দৃঢ় পদবিক্ষেপে আগাইয়া গিয়া সে বলিল,—'এস বাবু; আমার নায়ে চল,—আমি তোমাকে পার ক'রে দেব।'

ভদ্র যুবকটি আর বাক্যব্যয় না করিয়া প্রায় দৌড়াইয়া গিয়া নৌকায় উঠল, মাঝিটিও আর কথা না বলিয়া নৌকায় উঠিয়া 'বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনের' নাম লইয়া নৌকা খুলিয়া দিল। পাড় হইতে এক মাঝি চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল—'মরেছে রে, ব্যাটা মরেছে—টাকার লোভে মরেছে। ব্যাটা নিজে মরলে টাকা দিয়ে তুই করবি কি?' অন্য মাঝিরাও এই মতই প্রকাশ করিল,—কিন্তু মনের একটা দৃঢ় সংকল্প এবং বলিষ্ঠ বাহুর অফুরন্ত বল লইয়া যুবক-মাঝি এতক্ষণে কূল হইতে প্রায় একশ' হাত দূরে চলিয়া গিয়াছে। হেঁইও—হেঁইও করিয়া মাঝি বৈঠা টানিতেছে, নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ

নদ র জলে নৌকাখানি একটি মাত্র যাত্রী লইয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিতেছে। তীরের সকল লোকের বিস্মিত দৃষ্টি এই নৌকার দিকে।

মাঝির প্রাণপণ চেষ্টা ঝড় উঠিবার পূর্বেই সে কোনও মতে নৌকাখানি লইয়া ওপার যাইতে পারে কিনা; বৈঠার টানে টানে তাহার সব শরীরে দর দর করিয়া ঘাম ছুটিয়াছে—মুখমণ্ডল লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা—দূর হইতে শোনা যাইতেছে, অসংখ্য দৈত্যের মতন শোঁ শোঁ করিতে করিতে বাতাস ছুটিয়া আসিতেছে—তীরতরুগুলি ক্ষিপ্রদোলায়মান শাখাবাহু দ্বারা প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে—আর সম্মুখে ফুঁসিয়া গর্জিয়া ধাওয়া করিয়া আসিতেছে অসংখ্য ঢেউ—দুইটি প্রাণিসহ সেই ক্ষুদ্র নৌকাখানিক যেন একসঙ্গে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।

ভয়ে যাত্রীর প্রাণ কোথায় উড়িয়া গেল, নৌকার মধ্যে সে আতঙ্কে নড়াচড়া করিয়া নৌকাখানিকে এ-কাত ওকাত করিয়া দিতে লাগিল। 'নড়চড় না করে ঠিক হয়ে বসে থাক দেখি বাবু'—বলিয়া কঠোর ধমক দিয়া উঠিল মাঝি।

কিন্তু স্থির হইয়া বসিতে দিতেছে কে? ঢেউয়ের পর ঢেউ আসিতেছে যেন আকাশজোড়া। নৌকার পাছার :দিকটা যখন মাঝিকে লইয়া একেবারে নিচে বসিয়া যাইতেছে, আগার দিকটা তখন ঢেউয়ের মাথায় জাগিয়া উঠিয়া নৌকাখানিকে প্রায় সোজা খাড়া করিয়া দিতেছে; পরমুহূর্তে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নৌকার আগা যখন নামিয়া যাইতেছে তখন মনে হইতেছে—সম্মুখে পথ শুধু অতল পাতালে। এদিক হইতে ওদিক হইতে জলের ঝাপটা আসিয়া নাকে-মুখে লাগিতেছে—নৌকার ভিতরে ঢুকিতেছে।

'মাঝি'—বলিয়া হঠাৎ আর্তস্বরে চিৎকার করিয়া ওঠে নৌকার যাত্রী,—মাঝি চেঁচাইয়া বলে,—'তুইদিকের তু'খাখা কাঠ শক্ত ক'রে ধ'রে ব'সে থাক বাবু, আর মা'র কথা ভাব।

ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া সেইভাবেই বসিয়া থাকে যাত্রী; মাঝে মাঝে এক-আধবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছে মাঝিকে—কি বাঘের বল এই মাঝির গায়! এত ঢেউ—এত বাতাস—কিন্তু একটু টলে না তাহার হাত,, একটু টলে না তাহার বৈঠা—ইহারই মধ্যে মধ্যে আবার সুযোগ বুঝিয়া বৈঠা তুলিয়া সে ঢেউয়ের গায়ে খাবল মারিতেছে—ঠিক হিংস্র বাঘের মতন। এক আধবার চোখ খুলিয়া দেখে—আবার পরক্ষণেই চোখ বুজিয়া ভাবিতে থাকে মায়ের কথা—মা বিপদবারিণী—সর্বমঙ্গলা!

আশ্চর্য! সত্যই মা বিপদবারিণী সর্বমঙ্গলা! একটু একটু করিয়া ঝড়ের দাপটটা যেন কমিয়া আসিতেছে। এতক্ষণে বৃষ্টি নামিয়া গিয়াছে, কিন্তু বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের বেগ পড়িয়া আসিতেছে, আস্তে আস্তে বাতাসটা থামিয়াই আসিল।

পুরা একঘণ্টা দাপাদাপির পর নৌকা সত্যই আসিয়া ওপারে পৌঁছিল। এতক্ষণে ঝড় থামিয়াছে, বৃষ্টির ধারাও কমিয়া আসিতেছে, টিপ্ টিপ্ বর্ষা পড়িতেছে। নৌকা হইতে কূলে নামিয়া যুবকটি আর মাঝিটি মুখোমুখি দাঁড়াইল, কেহই যেন সহসা কথা বলিতে পারিতেছে না। নিচের মাটির দিকে চোখ ফিরাইয়া যুবকটি ভাবিতেছে, এই মাঝিকে কি দেওয়া যায়? শুধু টাকা দিয়া ফিরাইবে? মন সরে না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যুবকটি জিজ্ঞাসা করিল,—অতি

ধীর কণ্ঠে—একান্ত আত্মীয়ের সুরে,—'মাঝি এই বিপদ্ মাথায় ক'রে আজ কেউ নৌকো খুলল না, তুমি কেন এলে ?'

যুবক দেখিল মাঝি নিরুত্তর,—কিছু পরে সে বলিল,—'বাবু, নাও খুলেছি টাকার লোভে নয়, তোমার মুখের একটা কথা শুনে। আমিও আমার মায়ের এক ছেলে। দু'বছর আগে প্রায় এমন দিনে—একদিন হঠাৎ খবর পেলাম, মায়ের খুব অসুখ—মা আর বাঁচবে না। এমনই ছিল ঝড়-বৃষ্টি—সে বিকালে আর নাও খুলতে সাহস পেলুম না, সারা রাত চলল ঝড় বৃষ্টি, থামল পরদিন সকালে। পরদিন সকালে নাও খুলে বাড়ি পোঁছেছি দুপুরে, গিয়ে আর মাকে দেখতে পেলাম না,—চলে গেছেন আগের দিন সন্ধ্যায়ই।'—বলিতে বলিতে মাঝির চোখে ছল্‌ছল্ করিয়া জল ভরিয়া আসিল।

যুবকটি আগাইয়া আসিয়া মাঝির হাত দুইটি অভিভূতের মতন চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে বলিল, 'মাঝি, তোমাকে আজ এখানে এখন ছেড়ে দেব না, তোমাকে আমার সঙ্গে আমার বাড়ি যেতে হবে।'

মাঝি একটু ভাবিয়া বলিল,—'নাও কার কাছে রেখে যাব বাবু, নাও যে চোরে নেবে।'

যুবক উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল,—'এখান হ'তে এই আধক্রোশ আমার বাড়ি—আমি বাড়ি গিয়েই নৌকায় লোক পাঠাব—আর এর মধ্যে যদি চুরি যায় ত' নোতুন নৌকো তোমাকে আমি কিনে দেব।'—বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মাঝিকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া যুবক বাড়ি চলিল।

বাড়ি পৌঁছিয়া যুবক শুনিল, মায়ের অবস্থা খুবই সঙ্গীন হইয়াছিল, আজ সকাল হইতে অনেকটা ভালর দিকে। যুবক সত্যই নৌকায়

অন্য লোক পাঠাইয়া দিল, এবং মাঝিকে মহাসমাদরে রাত্রে খওয়া থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিল।

সকালবেলা মা যখন যুবকটির কাছে পূর্বদিনের সকল কথা শুনিলেন তখন বলিলেন,—'আমি ত' উঠতে পারব না, আমার ঘরের মধ্যে—আমার এই বিছানার পাশেই একবার তাকে ডাক।'



মাঝি আসিলে নিজের ছেলে ও মাঝি উভয়কেই ইসারায় কাছে ডাকিয়া মা তাঁহার রোগশীর্ণ দুইখানি হাত দুইজনের মাথায় রাখিলেন। বিছানার পাশে বসিয়া ছিলেন পাশের বাড়ির বেঁচু বাঁড়ুজ্যের স্ত্রী—

তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়িয়া রোগিণীর কানের কাছে গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেন, – 'করিস্ কি লো বামুন ঝি, বিছানায় ব'সে কাকে ছুঁয়ে দিচ্ছিস্—চাঁড়াল যে!'

মৃদুহাস্যে মাতৃমুখের প্রশান্ত মহিমা ব্যঞ্জিত করিয়া রোগিণী তেমনই ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিলেন,—'ছেলের কি আর কোনও জাত থাকে দিদি!'

———



বহুদিনের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বংশ, এখন আর তেমন পণ্ডিত কেহ না থাকিলেও দশ গাঁয়ে নাম মর্যাদা যথেষ্ট। পঞ্চানন এই বংশের লোক বলিয়া শাস্ত্র ভাল না জানিলেও পণ্ডিত নামে খ্যাত। অনেক দিন মনের দুঃখে কাটিয়া গিয়াছে পঞ্চাননের,—কারণ তাহার কোনও সন্তান ছিল না। শেষে নিজের বাড়ির বড় একটি বেলগাছের মূলে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার আশীর্বাদেই বেশি বয়সে লাভ করিল একটি পুত্র—শিবের পূজা করিয়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সাধ করিয়া সে ছেলেটির নাম রাখিয়াছিল শিবাই।

দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—দেখিতে দেখিতে শিবাই গায়ে-

পায়ে বেশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু শিবের বরে জাত শিবাই-এর শিবের মতনই কতগুলি বিশেষ চরিত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাড়িতে সে যতটুকু সময় থাকে ততটুকু সময় ভাঙের নেশায় নয়—ঘুমের নেশায় অচেতন থাকে; বাদ বাকি কাল শ্মশানে-মশানে না ঘুরিলেও গ্রামের বনে বাদাড়ে আগানে-বাগানে বগল বাজাইয়া এবং গাল বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু দেখিতে দেখিতে বয়স যে নয় পার হইতে চলিল। বামুন-পণ্ডিতের ঘরের ছেলে—পিতামহ বরদা বিদ্যারত্ন ছিলেন এ-তল্লাটের নামজাদা পণ্ডিত। পঞ্চানন পণ্ডিতের ইচ্ছা, শিবাই তাহার সংস্কৃত শিখিয়া শাস্ত্র পাড়িয়া পণ্ডিত হয়।

শহর হইতে একদিন অনেক নোতুন নোতুন খেলনা কিনিয়া আনিয়া পঞ্চানন পণ্ডিত শিবাইকে সযত্নে কাছে ডাকিল; তাহার হাতে সব খেলনা গুলি তুলিয়া দিয়া বলিল 'কেমন, খুশী ত?'

মাথা নাড়িয়া শিবাই সাড়া দিল 'হু'।

শিবাইকে আরও একটু কাছে টানিয়া পঞ্চানন বলিল,—'এখন যে তুমি বড় হ'য়ে উঠেছ শিবাই, বামুনের ছেলে, এখন যে তোমার পৈতে দিতে হয়, একটু লেখাপড়াও শিখতে হয়।'

নাক মুখ কুঁচকাইয়া শিবাই বলে,—'ভাল লাগে না।'

আরও আদর করিয়া পঞ্চানন গায়ে হাত বুলাইয়া বলে,—'তবে কি তোমার ভাল লাগে?'

সাহস পাইয়া শিবাই বলে,—'কাজকর্ম লেখা-পড়া কিছুই আমার ভাল লাগে না, আমার ইচ্ছে করে দিনরাত্রির একটু শুয়ে ঘুমিয়ে থাকি।'

পঞ্চানন ঠাস করিয়া শিবাই-এর গালে একটি বাইশ সের ওজনের

চড় বসাইয়া দিয়া রাত্রিরের জন্য গোরু-বাছুরের জাবনা কাটিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু বংশের একমাত্র ছেলে, ইহাকে এই রকমভাবে ছাড়িয়া



দিলেত চলিবে না। সুতরাং শিবাই-এর যতই অনিচ্ছা থাকুক না, প্রায় জোর করিয়াই শিবাইকে পঞ্চানন পূর্ব পাড়ার কালীপণ্ডিতের

টোলে ভর্তি করিয়া দিল। কিন্তু ভর্তি করিয়া দিলে কি হইবে, বর্ণ-পরিচয় ভালভাবে করাইতে পারিলে তবেত সংস্কৃতের কলাপ ব্যাকরণ পড়াইবে। কালীপণ্ডিত আবার শিবাইকে কিছু বলিতেও পারিতেছে না। তাঁহার টোলে ভর্তি হওয়া অবধি শিবাই এমন করিয়া তাঁহাকে সেবা করিতেছে যে সে কার্যতঃ তাঁহার মুখই বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

কালীপণ্ডিতের বাহির বাড়িতে অনেক পুরোনো কালের একটি গোসাঞ্রির দালান রহিয়াছে, তাহাতে আছে একটি মাচাসদৃশ পাটাতন, গোসাঞ্রি এখন সেখানে বসিয়াই নিত্যপূজার চাল-কলা পান,—বাকি নিচটায় কালীপণ্ডিতের পাঠশালা টোলের যুক্ত অধিবেশন বসে। শিবাই কিন্তু প্রথম হইতেই বাড়ির ভিতরে গিয়া আলাপ-সালাপ ডাক-পরিচয় করিয়া দিব্যি জমাইয়া লইয়াছে। আসিবার কালে সে বাড়ি হইতে কালীপণ্ডিতের বৃদ্ধা মাতার শিবপূজার জন্য রোজ একডালা বেলের ত্রিপত্র লইয়া আসে। কালীপণ্ডিত যে একটু অতিরিক্ত তামাকুপ্রিয় এ কথাটা শিবাই প্রথম দিনেই বুঝিয়া লইয়াছে এবং বাড়ির ভিতরে কোথায় তামাকের ডিবে, কোথায় আগুনের তাওয়া, কোথায় টিকার কৌটা—সবই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লইয়াছে, কালীপণ্ডিতকে এখন আর কিছু বলিতে হয় না, শিবাই আপনা হইতেই এক দণ্ড পর পর তামাক সাজিয়া দেয়—গুরুর মগজ সেই টিকার তাপে এবং তামাকুর ধোঁয়ায় যতই গরম হইয়া উঠে মেজাজটি ততই ঠাণ্ডা থাকে। ইদানীং আবার বর্ষাকাল পড়িয়াছে অবধি শিবাই-এর সেবার আর একটি মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে, সে গুরুর ঘড়ম জোড়া দুয়ারের কাছে আগাইয়া রাখিয়া এক ঘড়া জল রাখিয়া দেয়, তাহা দ্বারাই গুরু পদপ্রক্ষালন করিয়া অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করেন।

কিন্তু কালীপণ্ডিত লক্ষ্য করিলেন, এই সব ছাড়া শিবাই আর কিছুই করে না ; নিজের আসনে বসিয়া বসিয়া সে ঝিমায়, ঝিমাইতে ঝিমাইতে সে অনেক সময় এমনভাবে কাত হইয়া পড়ে—দেখিলে মনে হয়,—আহা একটা বালিস আগাইয়া দিলে কত আরাম হইতে পারিত। পঞ্চানন ঠাকুর বার বার কালীপণ্ডিতকে তাগিদ দিয়া গিয়াছে—তাহার ছেলে যেন সংস্কৃতে ভাল পণ্ডিত হয় ; বর্ণ-পরিচয় শেষ হইলেই যেন কলাপ-ব্যাকরণ আরম্ভ হয়। কিন্তু বর্ণ-পরিচয়েরই ত কোনও সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, কালীপণ্ডিত এবারে একটু ভাবিতই হইয়া উঠিলেন।

একদিন টোলের পড়া সেদিনকার মত শেষ হইয়াছে, পড়ুয়াগণ যে যাহার বাড়ি চলিয়া গিয়াছে ; কালীপণ্ডিত তাঁহার আসনেই বসিয়া আছেন। শিবাই শেষবারের তামাক ছিলিম সাজাইবার জন্যে বাড়ির ভিতরে গিয়াছে। শিবাই সম্বন্ধে কি করা যায় কালীপণ্ডিত তাহাই বসিয়া ভাবিতেছিলেন। আজ ঠিক করিলেন। মিষ্টি কথায় শিবাইকে কিছু শোধরানো যায় কিনা একবার সেই চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

তামাকসাজা কলকায় ফুঁ দিতে দিতে শিবাই আসিয়া হাজির। তামাকে টান দিয়া মহা আরামে ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কালীপণ্ডিত বলিলেন,—'দেখরে শিবাই, এই প্রাচীন কালে গুরুগৃহে কি হ'ত জানিস্? ছাত্ররা লেখা-পড়া তেমন বেশি করত না, দিনরাত গুরুর সেবা করত। এমনি অনেক বছর গেলে গুরু একদিন ছাত্রকে ডেকে তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বর দিয়ে দিতেন,—আর ছাত্রের ঠিক সেই বরই লাভ হ'ত। আমাকে ত তুই সেবা অনেক

করলি—তোকে আজ যদি আমি সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাই, আমার কাছ থেকে তবে কি বর নিবি ?'

হাসিয়া শিবাই বলিল,—'এই বর নিতুম যে আমাকে সারা জীবন যেন কোনও কাজকর্ম কিছু না করতে হয়, যেন আরামে ঘুমিয়ে কাটাতে পারি।'

শুনিয়া কালীপণ্ডিতের মাথায় যেন সহসা এক ঝলক রক্ত উঠিয়া গেল, এত দিনের এত সেবার কথা সব ভুলিয়া গিয়া কালীপণ্ডিত শিবাই-এর কান দুইটি ধরিয়া যতখানি জোরে পারেন তিনটি ঝাঁকি দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন, বলিয়া দিলেন শিবাই যদি ভাল চায় ত এমুখো আর কোনও দিন যেন না হয়।

বিকালবেলা রাগটা একটু পড়িয়া আসিলে হাঁটিতে হাঁটিতে কালী-পণ্ডিত একবার পঞ্চানন পণ্ডিতের বাড়ির দিকে গেলেন এবং পঞ্চানন ঠাকুরকে বলিয়া আসিলেন, শিবাই-এর নশ্বর দেহে রাজচক্রবর্তী হইবার সব লক্ষণই বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হইতেছে, বড় হইয়া পাচকব্রাহ্মণের কার্যগ্রহণ করা ব্যতীত শিবাই-এর আর গত্যন্তর নাই ;—সুতরাং এ-অবস্থায় তাহাকে আর রোজ রোজ তাহার টোলে না পাঠানই ভাল।

কালীপণ্ডিতের টোল এক রকম ছিল ভাল। তামুক সাজিতে টিকার আগুনে হাতে কয়েকবার ফোস্কা পড়িলেও আর তেমন বিশেষ ঝঞ্ঝাট কিছুই ছিল না। সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া শিবাই-এর দিনগুলি তেমন শান্তিতে কাটিতেছে না, ঘুড়ির পিছনে যেমন সূতা থাকে —এবং সেই সূতা যেমন ঘুড়িয়ে মুক্ত আকাশে অঢেল বাতাসে গা ভাসাইয়া দিয়া আরামে বেড়াইতেও দেয় না, ঘুমাইতেও দেয় না—পিতাঠাকুরও

তেমনি শিবাই-এর পিছনে লাগিয়া থাকিয়া তাহাকে বাড়িতে বসিয়াও ঝিমাইতে দেয় না, গাল বাজাইয়া পাড়ায় স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়াও বেড়াইতে দেয় না। মিষ্টিরসের পর্বটা এখন একেবারেই চলিয়া গিয়াছে—এখন তিক্ত কটু, ঝাল-কষায়—এই সব উপদ্রবই দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে।

রাধানাথ দত্ত বড় শান্তমেজাজের মানুষ, পঞ্চানন ঠাকুরের অকৃত্রিম হিতৈষীও বটেন—রাধানাথ আসিয়া একদিন পঞ্চাননকে ডাকিয়া বলিলেন,—'দেখ পঞ্চানন, ছেলে এখন বড় হয়েছে, অত গালি-গালাজ মার-ধরে তেমন কিছুই কাজ হবে না ;—ওতে ছেলে দিন দিন আরও বেয়াড়া হয়ে যাবে। তার চেয়ে বেণুগ্রামে শুনেছি এক ব্রহ্মচারী অনেকদিন আশ্রম করে আছেন, ছেলেপিলেদের নাকি ভাল লেখা-পড়া কাজকর্মের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। আমার বেহাই মশাই সেদিন ব'লে গেলেন, তাঁর সেজো ছেলেটা একেবারে গোঁয়ার-গোবিন্দ, আকাট মুখ্‌খু ছিল—বনে-বাদাড়ে শুয়োর তাড়ানো আর পাখী মারা ছাড়া তার আর কাজ ছিল না ; ঐ আশ্রমে তিন বছর থেকে ছেলেটা নাকি দিব্যি মানুষ হ'য়ে ফিরে এসেছে। তুমিও তাই কর, ছেলেটাকে সেই ব্রহ্মচারী বাবার কাছেই রেখে এস। বেশি কিছু দূর নয়, বেণুগ্রাম এখান থেকে তের-চোদ্দ মাইল পথ, নিজেরাই গিয়ে সব সময় খোঁজ-খবর, তত্ত্ব-তালাসি করতে পারবে।'

পরামর্শটা পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দ লাগিল না। বেশি আর সময় ক্ষেপ না করিয়া সে শিবাইকে বেণুগ্রামের ব্রহ্মচারীর আশ্রমেই রাখিয়া আসিল। আশ্রমের সব কিছু দেখিয়া-শুনিয়া এবং ব্রহ্মচারীর

সহিত আলাপ-সালাপ করিয়া সে বেশ খুশী হইয়া এবং মনে মনে বেশ একটা আশা লইয়া বাড়ি ফিরিল।

যেদিন শিবাই বেণুগ্রামের আশ্রমে গিয়া পৌঁছিয়াছে সেদিন সেই আশ্রমের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন, সবাই খুব ব্যস্ত। প্রতিমাসের শুক্লা একাদশীতে আশ্রমবাসী ছেলেবুড়ো সকলেরই সারাদিন উপবাসী থাকিতে হয় সন্ধ্যার পরে সমবেত যজ্ঞ হয়—তাহার পরে সকলে প্রসাদান্ন ভোজন করে। শিবাই-এর এই প্রথম দিন বলিয়া আজকের দিনটা তাহাকে রেহাই দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু আশ্রমকর্তা ব্রহ্মচারিজী তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছেন, সন্ধ্যার পর যে যজ্ঞ হইবে শিবাই যেন সেই যজ্ঞে যোগ দেয়, সেই যজ্ঞ-সমাপনান্তে শিবাই-এর সহিত তিনি একাএকা কথা বলিবেন এবং আশ্রমে যে-ভাবে তাঁহাকে জীবন চালাইতে হইবে তাহা সবিস্তারে বলিয়া দিবেন। পুলিসের হেফাজতে ধৃত আসামীর ন্যায় শিবাই ভীত-সন্ত্রস্ত মনে এই চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কপালে আজ কি-আছে কে জানে। আজ কেবল বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া এই কথাটি শিবাই-এর মনে হইতেছে—ইহা অপেক্ষা ঘুমের মাত্রাটা একটু কমাইয়া দিয়া এবং কাজের মাত্রাটা বাড়াইয়া দিয়া নিজেদের বাড়িতে বসিয়া বাপের কথাটা শুনিয়া চলিলেই ভাল হইত। এ আসিয়া সে কোথায় পৌঁছিল? বন্দীনিবাস হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে কে?

সন্ধ্যার একটু পরে সত্যসত্যই আশ্রম-প্রাঙ্গণে যজ্ঞের সমারোহ বসিয়া গেল। সে একেবারে সমারোহই বটে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে এক বেদি নির্মিত হইয়াছে; সেই বেদির উপরে বেলকাঠ এবং ডুমুর কাঠ দিয়া আগুন জ্বালান হইয়াছে; সেই আগুনকে ঘিরিয়া

আশ্রমবাসী সকলে বসিয়া গিয়াছে। সকলেরই সামনে ঘৃতমাখান কিছু বেলের ত্রিপত্র। আশ্রমকর্তা ব্রহ্মচারিজী মধ্যস্থলে আসন করিয়া বসিয়াছেন ; তিনি প্রথমে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে ত্রিপত্রের আহুতি দিতেছেন—সমস্বরে সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া সকলেই অগ্নিতে ত্রিপত্রের আহুতি দিতেছে। নানারকমের সুর করিয়া মন্ত্র পাঠ হইতেছে—অগ্নিতে ঘৃতমাখন ত্রিপত্র পড়িয়া পড়িয়া যজ্ঞের গন্ধে সমস্ত আশ্রম ভরিয়া গিয়াছে। সর্বত্রই একটা গম্ভীর ভাব। মন্ত্রচালিতের ন্যায় শিবাইও একপ্রান্তের একটি আসনে বসিয়া সকলের দেখাদেখি আগুনে বেলপাতা আহুতি দিতেছিল।

যজ্ঞ শেষ হইয়া গেলে ব্রহ্মচারিজী সকলকে নিজ নিজ ঘরে প্রস্থান করিয়া প্রসাদান্ন গ্রহণ করিবার আদেশ দিলেন, শুধু শিবাইকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি শিবাইকে তাঁহার কাছে ডাকিলেন, সস্নেহে তাঁহার সর্বদেহে হাত বুলাইয়া দিয়া তাহার নাম-ধাম পরিচয় প্রভৃতির ভিতর শিবাই-এর প্রাথমিক ভয়টা ভাঙিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। তারপরে আরও অতি স্নেহকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—'দেখ বাবা, আমার এই আশ্রমে যত ছেলেবুড়ো দেখছ সকলেই জীবনের কিছু না কিছু একটা উদ্দেশ্য—একটা অভীষ্ট নিয়ে এসেছে, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় ক'রে দেওয়া—সেই অভীষ্ট পূরণ ক'রে দেওয়াই হচ্ছে আমার কাজ। তোমার কি অভীষ্ট বাবা ?'

শিবাই কিছুই কথা বলে না,—মাথাটা নিচু করিয়া হাতের কাছের একটা বেলপাতাকেই আস্তে আস্তে ছিড়িতে থাকে।

ব্রহ্মচারী আবার স্নেহকণ্ঠে বলিলেন,—'তোমার কোনো ভয়

নেই বৎস,—এখানে আমরা কারোর উপরেই কোনও জোর জবরদস্তি করি না; তোমার সত্যি যাতে আনন্দ তুমি তাই নির্ভয়ে আমাকে খুলে বল।'

শিবাই তবু কথা বলে না, মাথা নিচু করিয়া থাকে।

ব্রহ্মচারী আবার বলিলেন,—সকলেরই সব কাজে আনন্দ নেই,—সকলেই একরকমের জিনিস চায় না; তোমার সত্যি যা ইচ্ছা তাই তুমি খুলে বল,—এখানে শুধু তুমি আর আমি—এসব কথা আর কেউ শুনবে না, তুমি নির্ভয়ে বল তোমার অভীষ্ট কি।'

এতখানি স্নেহ এবং আশ্বাস পাইয়া শিবাই সত্যই যেন মনে বল পাইল, সে বলিল, 'আমার ইচ্ছা আমাকে কাজকর্ম কিছুই না করতে হয়, দিনরাত বেশ ঘুমিয়ে কাটাই।'

ব্রহ্মচারী উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—'বেশ ত, এত ভাল কথা, এতে আনন্দ কার না হয়! তুমি এসব বলতে এত সঙ্কোচ বোধ করছ কেন? আমি তোমার জীবনে এই অভীষ্টই লাভ করিয়ে দেব। কিন্তু জানত বৎস, অভীষ্ট লাভ করতে হ'লে সাধনা করতে হয়, ধ্রুব কত কঠোর তপস্যা ক'রে তার অভীষ্ট লাভ ক'রেছিল, জানত সে সব কথা?'

উৎসাহিত হইয়া শিবাই হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'সে সব জানবে বৈকি, তুমিও ত আরেকটি ধ্রুব—কিছু দিন অমনি তপস্যা করতে পারলে তুমিও তোমার অভীষ্ট লাভ করতে পারবে। সে তপস্যা তুমি পারবে ত বৎস?'

শিবাই সোৎসাহে বলে,—'হ্যাঁ'।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'বেশ বেশ, এইত চাই। বেশি নয়, ঠিক

একটি বছর তোমাকে তপস্যা করতে হবে, তবেই তোমার অভীষ্টপূরণ হবে। আসল জিনিসটা হচ্ছে কি জান,—তোমার যেটা মনস্কামনা সেটা পূরণ করা ঠিক মানুষের সাধ্য নয়—তা পূরণ করতে পারেন একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেব। তবে দেবাদিদেব হ'লেও তিনি আশুতোষ—বড় অল্পেই তুষ্ট হন; তুমি বেশ অল্পেই তাঁকে তুষ্ট করতে পারবে, আমি তার পথ শিখিয়ে দেব। মহাদেব যদি একবার তুষ্ট হ'য়ে বর দেন তবে মানুষ আর কি করে তোমার পথ আটকাবে? তুমি কিচ্ছু ভেব না, কিচ্ছু ভয় পেয় না, আমি সব ঠিক ক'রে দেব। আজ তুমি যাও—খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্তে গিয়ে ঘুমোও; কাল তোমাকে একটু রাত থাকতে উঠতে হবে, উঠে তুমি এইখানেই চলে আসবে, আমাকে তুমি এই আসনেই দেখতে পাবে; আমি কাল তোমাকে মহাদেবের সাধনা শিখিয়ে দেব।'

খাইয়া-দাইয়া বিছানায় শুইয়া প্রথমটায় একটা নোতুন আশা আতঙ্কে শিবাই-এর ঘুম আসিতেছিল না। তাহার কেমন বিস্ময় লাগিতেছিল, তাহার জীবনের অভীষ্টও কি পূরণ হইতে পারে? তা ছাড়া সে আজ সারাদিন দেখিয়াছে, এখানকার ছেলেবুড়ো সব লোকই কেমন সারাদিম কর্মব্যস্ত; ইহার মধ্যে সে একা একা সারাদিন কোথায় পড়িয়া ঘুমাইবে? কিন্তু সন্ধ্যার সেই যজ্ঞ এবং তাহার পরে ব্রহ্মচারীর সেই কথাগুলিকেও ত সে অবিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। বার বার তাহার মনে হইতেছিল, এই ব্রহ্মচারীর কথা একেবারে মিথ্যা হইতে পারে না,—কিছু সত্য তাঁহার কথায় নিশ্চয়ই আছে। ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমাইয়া পড়িল—কিন্তু আজ আর বেলা চারি দণ্ড পর্যন্ত সে বিছানায় পাশমোড়া দিতে লাগিল না, উৎসাহে ঠিক অন্ধকার রাত

থাকিতে উঠিয়া পড়িয়াছে—উঠিয়া সে সোজা চলিয়া গেল সেই যজ্ঞভূমিতে। গিয়া দেখে ব্রহ্মচারী অনেক পুর্ব হইতেই সেই বেদির আসনে বসিয়া আছেন।

শিবাইকে দেখিয়াই ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'হ্যাঁ তুমি পারবে, তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি—দৃঢ় তোমার সঙ্কল্প – অটুট হবে তোমার সাধনা—নিশ্চিত তোমার সিদ্ধি লাভ। তুমি আমার সঙ্গে এস।'—বলিয়া ব্রহ্মচারী তাহার হাতখানা ধরিয়া সেই আবছা অন্ধকারের মধ্যে আশ্রমের পূব-উত্তর কোণের দিকে লইয়া চলিলেন। অনেকখানি জুড়িয়া এই আশ্রম—তাহার মধ্যে অনেক পুকুর, অনেক ফলের বাগান, অনেক শাক-সবজির ক্ষেত। একটি গাছের কাছে আসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'এইটি বেলগাছ ; ওর নীচে একটু লক্ষ্য করিয়া দেখ প্রতিষ্ঠিত আছেন শিব: ইনিঅর্ধজাগ্রত শিব, তাই পুরোপুরি দেখা যায় না। তোমার পিতার কাছে শুনেছি, শিবের বরে তোমার জন্ম, তাই এই শিবের কাছেই চলবে তোমার অভীষ্ট পূরোণের সাধনা কিন্তু একটা বিষয়ে তোমাকে খুব সাবধান ক'রে দিচ্ছি ; তুমি তোমার অভীষ্টের কথা এই আশ্রমের আর কোনও জনপ্রাণীকে বলবে না, তোমাকে আজ যে সাধনা দেব সে সম্বন্ধে আর কাউকে কিছু বলবে না। শেষরাত্রের অন্ধকারে একঘণ্টা এবং সন্ধ্যার অন্ধকারে একঘণ্টা—আপাততঃ দু'মাস এইভাবে চলবে। কেউ যদি কিছু দেখে ফেলে দেখুক, কিন্তু তুমি নিজের মুখে কাউকে কিছু বলবে না। লোকে জানাজানি হ'লে কখনও সিদ্ধিলাভ হয় না। বুঝলে ?

শিবাই ভক্তিভরে মাথা নাড়িল।

ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'তবে এইবারে এস, তোমাকে সাধনা শিখিয়ে দি! কিছুই না—একটা আসন মাত্র। প্রথম প্রথম হয়ত একটু কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে ঘাবড়ালে চলবে না। এই বিল্বমূলে শিবের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে প্রথমে সটান দাঁড়াবে। তার পরে আস্তে ডান পা তুলে দাঁড়াবে, হাত ছুখানি সোজা উর্ধ্বে টান ক'রে রাখবে; ডান পা ব্যথা হ'লে সেটা নামিয়ে বাঁ পা তুলে দাঁড়াবে; হাত ছখান ব্যথা হ'লে মাঝে মাঝে একটু নামিয়ে নেবে। আপাততঃ দিনে তু'বার এই যোগাসনটিই হ'ল তোমার সাধনা। এখন কোনও মন্ত্র নয়; কিন্তু তুমিও বামুনের ঘরের ছেলে—জান ত, মন্ত্র না হ'লে কোনও কার্যই সাধন হয় না; তু'মাস পরে তোমাকে মন্ত্র দেব,—এর মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক পড়াটা তোমাকে শিখে নিতে হবে।'

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী শিবাইকে নিজেই একবার আসনটি করিয়া দেখাইয়া শিখাইয়া দিলেন এবং তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অনেক মন্ত্র জপ করিয়া দিলেন।

তিন চারি দিন এই যোগাসন করিয়া শিবাই-এর সর্ব শরীর ব্যথা হইয়া উঠিল,—অনেকবার ভাবিল, পালাইবার চেষ্টা করিবে; কিন্তু ব্রহ্মচারীর কথার উপরে তাহার কেমন অটল বিশ্বাস আসিয়া গিয়াছে; তাই ভাবিতেছে, কিছুদিন এইরূপ কষ্টের সাধনা করিয়া সত্যই যদি সারা জীবন এত আরাম এবং আনন্দ লাভ করা যায় তবে এটুকু কষ্ট সহ্য করিয়া যাওয়াই ভাল। কেমন একটা স্বপ্নের নেশা পাইয়া বসিয়াছে শিবাইকে পালাই পালাই করিয়াও তাই পালান হয় না।

যোগাসনের সাধনা বেশ ভালই চলিতেছে দেখিয়া দুইমাস পরে ব্রহ্মচারী শিবাইকে ডাকিয়া বলিলেন,—'বৎস, তোমার মতন সাধক আমি বেশি দেখি নি, তোমার সিদ্ধি সুনিশ্চিত। কাল আমি স্বপ্নে দেখেছি, স্বয়ং মহাদেব এসে ব'লে গেছেন, শিবাই-এর সাধনায় আমি তুষ্ট হয়েছি। কিন্তু ধরেছ যখন তখন এইটুকুতে থামলে চলবে না বাবা, এগিয়ে যেতে হবে ; এখন তোমায় যোগাসনের সঙ্গে মন্ত্র-সাধনা দেব। এই নাও সেই মন্ত্রের গ্রন্থ,—শুনলুম তুমিত উৎসাহ বশে সংস্কৃতও এরই মধ্যে বেশ পড়তে শিখেছ—সকালে এক ঘণ্টা এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে হবে। এই বইএর এক-এক অধ্যায়ের মন্ত্র এক একদিন আবৃত্তি করবে।'

মহাদেবের সন্তুষ্টির কথা শুনিয়া শিবাই-এর উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল,—আবার দুইমাস চলিল নূতন সাধনা।

দুইমাস পরে ব্রহ্মচারী শিবাইকে ডাকিয়া বলিলেন,—'এইবারে তোমার সাধনার তৃতীয় পর্যায় উপস্থিত।'

যে বেলগাছের তলায় শিবাই-এর উপাস্য শিবপ্রতিষ্ঠিত তাহারই কাছে একটা জামরুল গাছের সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে দুইটি সবলকায় বৃষ ; সেই দুইটিকে দেখাইয়া দিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'বৎস শিবাই, তুমি জান আমাদের আশ্রমে অনেক গাভী আছে, আর আছে এই দু'টি বৃষ ; বৃষ মহাদেবের বাহন এ-কথা তোমাকে আর বুঝিয়ে দিতে হবে না ; আর এই বৃষের সেবা না ক'রে মহাদেবকে কখনও সন্তুষ্ট কয়া যায় না। আজ থেকে আশ্রমের এই বৃষ দু'টির সব ভার তোমার উপর ; এদের ঘাস, খড়-বিচালি সবই তোমাকে সংগ্রহ ক'রতে হবে,—আর রোজ দুপুরে এদের স্নান করিয়ে

একবার ক'রে এই বেলতলার মহাদেবের কাছে নিয়ে আসবে, আর এদের মাথায় দু'টো সাদা ফুল দেবার মন্ত্র আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।'

এখন আর কঠোরতাকে ভয় পায় না শিবাই। রোজ দু'বেলা দু'বার যোগাসন করিতে করিতে দেহ এখন তার বেশ মজবুত এবং কষ্ট-সহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে। তা ছাড়া সাধনায় সে এতদূর আগাইয়া গিয়াছে যে এখন আর পিছাইবার সে উপায় দেখিতে পায় না। পরের দিন হইতে আরম্ভ আবার মহাদেবের সাধনার সহিত তাঁহার বাহন বৃষের সাধনা।

এই বৃষের সাধনায় কাটিয়া গেল দীর্ঘ দিন। দেখা গেল সেখানেও শিবাই অল্পদিনেই বেশ সাফল্য লাভ করিল।

সাধনার শেষ পর্বে ব্রহ্মচারী বলিলেন,—এবারে বৎস তুমি ফুল-বেলপাতা দিয়ে শিবের পুজায় লেগে যাও—দিনে একবার— পাঁচ মিনিট তাতেই যথেষ্ট। তবে শুধু একটি কাজ তোমাকে করতে হবে, তোমার এই নিত্য শিবপূজার ফুল তোমাকেই তৈরী ক'রে নিতে হবে। তুমি এই বেলগাছের চারিদিকে ছোট একটি বাগান ক'রে নাও—সেই বাগানের ফুল দিয়েই তোমার শিবপূজা হবে।'

শিবাইকে আরও কাছে ডাকিয়া কানে কানে ব্রহ্মচারী বলিলেন,— জোর ভাগ্য তোমার শিবাই, এই শিবপূজার আদেশ দিয়ে গেছেন কাল রাত্রে আমাকে স্বয়ং শিবের অনুচর নন্দী। তিনি আরও ব'লে গেলেন, কোমার সাধনার সিদ্ধি তুমি অতি শীঘ্র লাভ করবে।'

আরও জোরে চলিতে থাকে শিবাই-এর সাধনা। এখন আর সারাদিনে তাহার বসিবার অবসর নাই কিন্তু তাহাতেই সে খুব খুশী।

দেখিতে দেখিতে এমনি করিয়া দুইটি বছর কাটিয়া গেল। একদিন সকাল বেলা ব্রহ্মচারী শিবাইকে ডাকিয়া বলিলেন,—'শিবাই, আশুতোষ মহাদেব তুষ্ট হয়েছেন—তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছ; তিনি তোমার যা মনোবাসনা ঠিক সেই বরই দিয়েছেন তোমাকে। আজ থেকে তুমি মুক্ত। সকাল বেলা ভাল ক'রে একবার শিব—ঠাকুরের পূজো দাও—তার পরে সব কাজ ছেড়ে দাও—। তুমি আজ থেকে আমার এই আশ্রমে দু'বেলা দু'টি খাবে আর সারা দিন ঘুমোবে।'

অভীষ্ট বর লাভ করিয়াছে শিবাই—সারাদিন তাহার মুক্তি। কিন্তু একদিন যায়—দু'দিন যায়—তিন দিনের দিন সকাল বেলা উঠিয়া শিবাই গিয়া ব্রহ্মচারীর কুটিরের বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—ভিতরে কাহারও প্রবেশের আদেশ নাই। শিবাই-এর প্রতি লক্ষ্য পড়িতেই ব্রহ্মচারী কুটিরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শিবাই, তোমার কিছু বলবার আছে?'

শিবাই মাথা নিচু করিয়া বলিল,—'আমাকে নোতুন কিছু কাজ দিন।'

'কেন?'

'সারাদিন শুয়ে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগছে না,—দিন যে আমার আর কাটছেই না।'

হাসিয়া ব্রহ্মচারী বলিলেন,—'তোমার সাধনায় সত্যি সিদ্ধি লাভ ক'রেছ তুমি শিবাই। আর তোমাকে আশ্রমে কোনো কাজ করতে হবে না—কাজ করতে হবে এখন দেশে বাড়িতে গিয়ে। আমি তোমার বাবার কাছে চিঠি দিয়ে দিয়েছি,—তিনি আজই

সন্ধ্যায় এসে পৌঁছবেন, কাল সকালে তোমাকে নিয়ে যাবেন। আর শোন বাবা, তুমি যে এখন শুধু সারাদিন কাজ করতে শিখেছ তা-ই নয়, শিবের সামনে ব'সে ব'সে তুমি এতদিন সংস্কৃত ব্যাকরণের মূলসূত্রগুলিই সব মুখস্থ ক'রে ফেলেছ, তাই ছিল তোমার মন্ত্র। এখন তোমাকে আশীর্বাদ করি, ঘুম আর আরাম ছেড়ে এইবারে কাজের ছেলে হও—আর কালীনাথ পণ্ডিতের টোলে আবার ভর্তি হ'য়ে বামুনের ছেলে সংস্কৃতটা বেশ ভাল ক'রে শিখে নাও। আমি তোমাকে ফাঁকি দেই নি বাবা,—তুমি সাধনা ক'রে সত্যি সত্যি মহাদেবের বর লাভ করেছ—সেই বরে দেখবে জীবনে তুমি কত বড় হ'য়ে উঠতে পারবে।'
